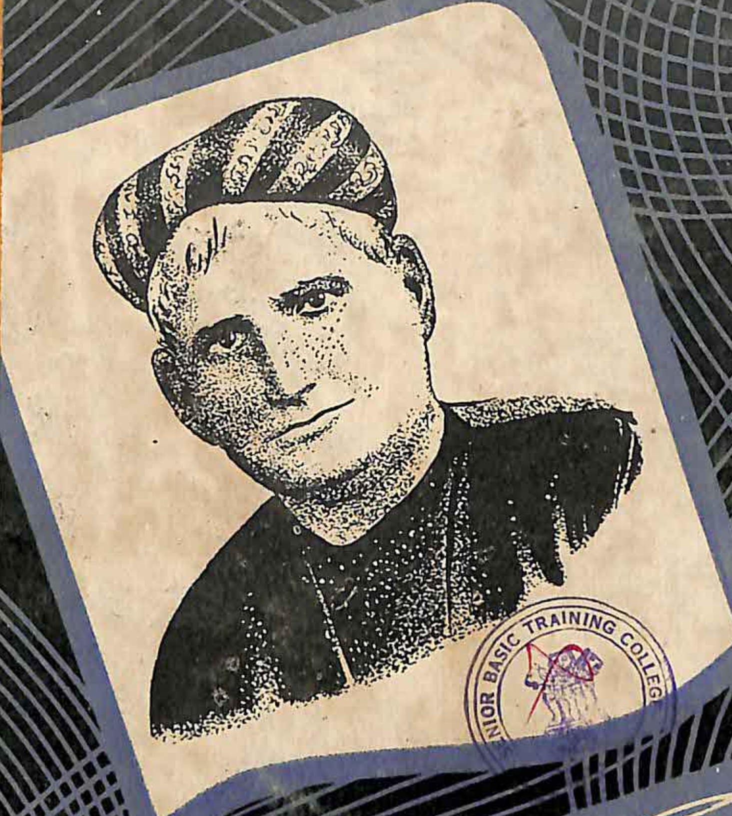


ষি বঙ্কিমচন্দ্র

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, মহাকবি মাইকেল, বাংলার শহীদ,
প্রতাপাদিত্য, মহারাজ নন্দকুমার প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীচন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট : কলিকাতা—১২

প্রথম মুদ্রণ : ১৩৫৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ : ১৩৬১

দাম : এক টাকা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এবং
১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড, সাধারণ প্রেস লিঃ হইতে শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক কর্তৃক মুদ্রিত।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

এক

যাঁহার জন্মগ্রহণে বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতি ধন্য হইয়াছে,—যাঁহার লেখনীস্পর্শে বাংলা সাহিত্য নবীন সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করিয়া এক অভাবনীয় নূতন শক্তি লাভ করিয়াছে,—যাঁহার অমর 'বন্দেমাতরম্' গানে সারা বাংলায়—সমগ্র ভারতবর্ষে এক নব জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, এই সেই বঙ্কিমচন্দ্র।

১২৪৫ সাল, ১৩ই আষাঢ়, ইংরাজী ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ, ২৭শে জুন রাত্রি ৯টায় কাঁঠালপাড়ায় বঙ্গগৌরব বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মের সময়ে মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টরের কার্য্য করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রেরা চারি সহোদর ছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তৃতীয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের শৈশবকাল মেদিনীপুরেই অতিবাহিত হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে খড়ি হয়। হাতে খড়ি দেন তাঁহাদের কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্য্য।

তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষার ভার অর্পিত হয় গ্রাম্য

পাঠশালার এক গুরু মহাশয়ের উপর। গুরু মহাশয়ের নাম রামপ্রাণ সরকার। গ্রামের পাঠশালায় সাধারণ বালকদিগের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠাভ্যাস আরম্ভ হইল। গুরু মহাশয় বালকের অপূর্ব্ব ধীশক্তি দর্শনে চমৎকৃত হইয়া গেলেন। যে বর্ণমালা শিক্ষা করিতে সাধারণ বালকদিগের একমাস কাটিয়া যায়, সেই বর্ণমালা শিশু বঙ্কিমচন্দ্র একদিনেই আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্র 'শিশুবোধক' পড়িতে আরম্ভ করিলেন। 'অলস' 'অবশ' জাতীয় শব্দগুলি তিনি দুই এক দণ্ডের মধ্যেই শেষ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তিনি গুরুমহাশয়কে বলিলেন,—"'অলস', 'অবশ' পড়িলেই 'বসন', 'পশম' ইত্যাদি পড়া হইল, ওগুলি আর পড়ার দরকার হইবে না, পাতা উল্টাইয়া যান।"

গুরুমহাশয় তখন বালককে 'গীত', 'কীট' প্রভৃতি পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাও শেষ করিয়া নূতন পাঠ পড়িতে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। গুরুমহাশয় বালকের এইরূপ তীক্ষ্ণ প্রতিভা দর্শনে ভীত হইয়া কহিলেন,—"এত তাড়াতাড়ি যদি তুমি পড়া শেষ করিয়া ফেল, তবে আমি আর কতদিন তোমাকে পড়াইব ?"

আট নয় মাস গ্রাম্য পাঠশালায় পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কার্য্যস্থান মেদিনীপুরে চলিয়া গেলেন। তথায় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন।

এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার কিছুদিন পরেই সম্মুখের পথ দিয়া এক বানরওয়ালা ডুগডুগি বাজাইয়া বানর লইয়া

যাইতেছিল। বালকসুলভ চাপল্য বশতঃ বঙ্কিমচন্দ্র ক্লাস ছাড়িয়া বানর দেখিতে দৌড়াইয়া গেলেন। বানর দেখিয়া তিনি বলিলেন,—"বাঁদরটাকে এনে আমাদের ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া দিলে হয়, দেখি, ইংরেজী শিখতে পারে কিনা।"

যখন বঙ্কিমচন্দ্র বানর দেখিয়া ক্লাসে ফিরিয়া আসিলেন, তখন শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে পাঠে অমনোযোগিতার জন্য বিশেষভাবে তিরস্কার করিলেন। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র অতিশয় ক্রুদ্ধ ও মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া নীরবে নিজের স্থানে বসিয়া এক সপ্তাহের পড়া এক ঘণ্টায় আয়ত্ত করিয়া শিক্ষক মহাশয়কে অবাক্ করিয়া দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শৈশব হইতেই কোনওরূপ ছুটাছুটি খেলায় বা ব্যায়াম প্রভৃতিতে যোগদান করিতে ভাল বাসিতেন না। শৈশব হইতেই তাস খেলাতেই তাঁহার প্রবল অনুরাগ পরিদৃষ্ট হইত। তাস খেলার প্রতি এই অনুরাগ তাঁহার শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে যাদবচন্দ্র ২৪ পরগণায় বদলী হইয়া আসেন। সেই সময় হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ায় বাস করিয়া হুগলী কলেজে পড়াশুনা করিতে থাকেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স এগার বৎসর। তখন এনট্রান্স, এফ্. এ. বা বি. এ. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই। তখন ছিল জুনিয়ার এবং সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা।

হুগলী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকগণ বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রতিভা, স্মৃতিশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দর্শনে চমৎকৃত ও বিস্মিত

হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন পড়াশুনায় সকলের অগ্রণী।

পাঠে তন্ময় হইয়া একস্থানে বসিয়া পড়াশুনা করা বঙ্কিমের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। যৌবনে তাঁহার এই চাঞ্চল্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই নিমগ্ন হইয়া থাকিতে বঙ্কিমচন্দ্র পারিতেন না। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিত। হুগলী কলেজের সুবৃহৎ পাঠাগার হইতে তিনি ইতিহাস, জীবনী, কাব্যগ্রন্থ, সাহিত্য প্রভৃতি লইয়া পাঠ করিতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকের সহিত তাঁহার কোনও সম্পর্কই থাকিত না। যখন পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিত, তখন তিনি পাঠ্যপুস্তক পাঠ করিতে আরম্ভ করিতেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইলে দেখা যাইত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন।

পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জনৈক সহপাঠীর নিকট বলিয়াছিলেন,—"পুস্তক পাঠে আমি যে আনন্দ পাই, আর কিছুতেই আমি তেমন আনন্দ পাই না।" বহরমপুরে অবস্থান কালে তিনি বলিয়াছিলেন,—"পুস্তক লিখিয়া আমি যে আনন্দ পাই, আর কিছুতেই তেমন পাই না।"

বঙ্কিমচন্দ্র ছুটাছুটি বা ব্যায়াম করিতেন না। তিনি অর্জ্জুনার পাড়ের নীচে কয়েক বিঘা জমি লইয়া একটি সুন্দর বাগান রচনা করিয়াছিলেন। উদ্যানের নাম ছিল 'ফুল বাগান।' উদ্যানের কিয়দংশে ছিল ফুলগাছ, অপর অংশে ছিল নানা রকম

ফলের গাছ। হুগলী কলেজের উদ্যান হইতে ভাল ভাল ফুলের গাছ আনিয়া তিনি এই বাগানে রোপন করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণের অধিকাংশ সময় তিনি এই উদ্যানের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র এই উদ্যান ছাড়িয়া সন্ধ্যার সময় কখন কখন খালের ধারে বেড়াইতে যাইতেন। এই খালে যাইবার পথটি ছিল বড় দুর্গম,—ঝোপ জঙ্গলের মধ্য দিয়া গিয়াছে। বঙ্কিম-চন্দ্র নির্ভীক চিত্তে একাকী এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই খালের ধারে যাইয়া লতাকুঞ্জে বসিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স যখন এগার বৎসর তখন পাঁচ বৎসর বয়স্কা একটি অনিন্দ্য সুন্দরী বালিকার সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই পত্নী এগার বৎসর তাঁহার জীবন সঙ্গিনীরূপে কাটাইয়া ষোল বৎসর বয়সে জ্বররোগে পরলোক গমন করেন। তখন বঙ্কিমের বয়স ছিল বাইশ বৎসর।

বঙ্কিমচন্দ্র আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু অবশেষে জনকজননীর একান্ত অনুরোধ এবং আগ্রহ এড়াইতে না পারিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে রাজি হন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই কন্যা দেখিয়া পছন্দ করিলেন। নির্দিষ্ট দিনে বিবাহ হইয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দ্বিতীয় পত্নীর নাম রাজলক্ষ্মী দেবী।

দুই

কিশোর বয়স হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র কবিতা লিখিতেন। তাঁহার এই কবিতা লিখিবার কোনও নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না। যখন ইচ্ছা হইত তখনই লিখিতেন। তিনি ফুলবাগানে বা গৃহে বসিয়া কবিতা লিখিতেন। তিনি অধিক রাত্রি জাগিয়া লেখা-পড়া করিতেন। এই ভাবে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়া যাইত।

বঙ্কিমচন্দ্র কৈশোরে ও যৌবনে ক্ষীণকায় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাহস ছিল প্রচুর। হুগলী কলেজে পড়িবার সময় এবং কর্ম্মাবস্থায় তিনি তাঁহার এই মানসিক সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

যৌবনে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে যখন বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় পাওয়া যায়। একদিন যখন তিনি রূপসা নদীর মোহনা পার হইতেছিলেন, তখন আকাশে মেঘ দেখা দিল। বঙ্কিমচন্দ্র নৌকায় উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। দীনবন্ধু মিত্র এবং জনৈক ওভারসিয়ার তাঁহার সহযাত্রী ছিলেন। মেঘ দেখিয়া তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে নৌকায় উঠিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই নিষেধ না শুনিয়া হাসিতে হাসিতে যাইয়া নৌকায় উঠিলেন। কতকদূর যাইতেই ঝড় উঠিল, প্রবল বেগে নৌকা আন্দোলিত হইতে লাগিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে

বিচলিত না হইয়া হাসিতে হাসিতে এবং গল্প করিতে করিতে নিরুদ্বেগচিত্তে নদী পার হইলেন।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তখনকার সাহিত্য-গগনের প্রদীপ্ত ভাস্কর। তিনি একখানি সংবাদ-পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ঐ পত্রিকাখানির নাম ছিল "সম্বাদ-প্রভাকর"। উহার দুইটি সংস্করণ বাহির হইত,—একটি দৈনিক এবং একটি মাসিক। তখনকার বহু উদীয়মান কবি ও সাহিত্যিক এই সম্বাদ-প্রভাকরে প্রবন্ধ ও কবিতাদি লিখিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত এই সমুদয় তরুণ কবি ও সাহিত্যিকদিগকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রও এই সম্বাদ-প্রভাকরে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে প্রথম গদ্য প্রবন্ধ রচনা করেন এবং ইহা ছাপার অক্ষরে মুদ্রিত হয়। সেই রচনার কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"গগনমণ্ডলে বিরাজিতা কাদম্বিনীর উপরে কম্পায়মানা শম্প সঙ্কাশ ক্ষণিক জীবনের অতিশয় প্রিয় হওত মূঢ় মানব-মণ্ডলী অহঃরহঃ বিষয় বিষার্ণবে নিমজ্জিত রহিয়াছে। পরমেশ প্রেম পরিহার পুরঃসর প্রতিক্ষণ প্রমদা প্রেমে প্রমত্ত রহিয়াছে। অম্বুবিম্বুপম জীবনে চন্দ্রার্কসদৃশ চিরস্থায়ী জ্ঞানে বিবিধ আনন্দোৎসব করিতেছে, কিন্তু ভ্রমেও ভাবনা করে না যে সে সব উৎসব শব হইলে কি হইবে এবং পরমনিধি প্রিয় পিতা পরাৎপরের প্রতি প্রীতি প্রভাবের অভাব করে, বিবেচনা করে না যে তাঁহার সমীপে উত্তরকালে কি উত্তর করিবে। কদাপিও

মূঢ় মানবমণ্ডলী মনোমধ্যে মুহূর্ত্তেকও বিবেচনা করে না যে তাহারা কি অনিত্য পদার্থ প্রযত্ন পুরঃসর প্রতিপালন করিতেছে। এখন যে দেহ ধূলিকণা পতনে পাষাণ প্রহার প্রায় বোধ হয়, আশু সেই দেহ শ্বসমূহের করাল পদাঘাতে বিদীর্ণ হইবেক। এখন যাহার রাজীব রাজী বিরাজিত শয্যাতেও নিদ্রা হয় না, জীবনান্তে সে ধূলি কর্দ্দম অস্থিকণাকীর্ণ লক্ষ লক্ষ রক্ষো, যক্ষ, ভূত, প্রেতাদির বাসস্থান শ্মশানে চিরনিদ্রিত হইবেক। এবং যে অঙ্গ কোমল কমল স্পর্শনে বিশীর্ণ হয় সে অঙ্গ গৃধিনী চঞ্চু আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিবেক।"—ইত্যাদি।

এই প্রবন্ধটি প্রভাকরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়সের লিখিত একটি কবিতার প্রথম কয়েকটি চরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হইয়াছে জল বড়ই শীতল,
ছুঁইলে বিকল হইতে হয়।
আগে যে জীবন জুড়াত জীবন,
সে বন এখন নাহিক সয়॥"

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের 'মানস' ও 'ললিতা' কবিতা গ্রন্থ লিখিত হয়। ইহা তাঁহার ষোড়শ বৎসর বয়সের রচনা। এই উভয় কাব্য-গ্রন্থই বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টাদশ বৎসর বয়সে সংশোধন করিয়া প্রকাশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বাল্যকালে একদিন সন্ধ্যার সময় খালের ধার

হইতে কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম পথে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তখন আকাশ নিবিড় মেঘে মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ঝড় উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'ললিতা' কাব্যগ্রন্থে সেই ঝড়ের বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে সেই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"গভীর জলদ নাদ, গড়ায় আকাশ ছাঁদ,
থেকে থেকে উচ্চতর স্বনে।
পবন করিছে জোর, যেন সাগরের সোর,
হুঙ্কারে গরজে প্রাণপণে ॥
বারেক চঞ্চলাভায়, দেখি নীল মেঘ গায়,
কটা মাথা নাড়ে ক্ষিপ্ত বন।
পাতা উড়ে ঢাকে ঘনে, পড়িতেছে ঘোর স্বনে,
বড় বড় মহীরুহগণ ॥"

হুগলী কলেজে অধ্যয়ন কালে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিখিয়াছিলেন তথাকার শিক্ষক ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট। তাঁহার সংস্কৃত শিক্ষা হয় কাঁটালপাড়া নিবাসী শ্রীরাম ন্যায়বাগীশের নিকট। পুঁথি বগলে করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় প্রত্যহ তাঁহার নিকট পড়িতে যাইতেন। চারি বৎসর ধরিয়া তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, সাহিত্য পড়িয়াছিলেন। এই চারি বৎসরে তিনি দশ বৎসরের পাঠ শেষ করিয়াছিলেন।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে একদিন বলিয়াছিলেন, "তোমার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট আছে, কিন্তু তুমি পদ্য না

লিখিয়া গদ্য লিখিবে।" বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্ত কবির এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তকে পরম গুরু জ্ঞানে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ হইতে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়িবার জন্য ভর্ত্তি হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে হইল। সঙ্গে ভৃত্য ও পাচক থাকিত।

১৮৫৮ সালে বি. এ. পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘোষিত হইল যে, ৫ই এপ্রিল পরীক্ষা গৃহীত হইবে। তখন পরীক্ষার মাত্র দুইমাস বাকি। বঙ্কিমচন্দ্র আইন পড়া ছাড়িয়া দিয়া বি. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সময় অতি অল্প, এই অল্প সময়ের মধ্যে বি. এ পরীক্ষায় প্রস্তুত হওয়া এক বিষম কঠিন ব্যাপার হইলেও বঙ্কিমচন্দ্র পশ্চাৎপদ হইলেন না। যথা সময়ে দশজন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিলেন। তন্মধ্যে দুইজন মাত্র উত্তীর্ণ হইলেন। প্রথমস্থান অধিকার করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিলেন বাবু যদুনাথ বসু।

পরীক্ষার ফল দেখিয়া ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য গ্রহণ করিবে?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "পিতাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া বলিতে পারি না।"

হ্যালিডে সাহেব বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা আর কি বড় চাকরী তুমি প্রত্যাশা কর?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর করিলেন, "যত বড় চাকরীই আপনি আমাকে দিন না কেন, পিতার অনুমতি না লইয়া আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি না।"

হ্যালিডে সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃভক্তি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি কিছুদিন সময় দিলাম। তোমার পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে সংবাদ দিও।"

চাকরী গ্রহণ করা বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত ছিল না, কেবল পিতার ইচ্ছাতেই তিনি কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর।

তিন

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম কর্ম্মস্থল যশোহর।

তখন রেলপথ হয় নাই। নৌকায় বা পাল্কীতে যাইতে হইত। যাইতেও তিন চারিদিন সময় লাগিত। বঙ্কিমচন্দ্র মাতাপিতা আত্মীয়-স্বজন ও পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী যশোহরে যাত্রা করিলেন।

এই যশোহরেই "নীলদর্পণ" প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্রের সহিত

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎভাবে আলাপ পরিচয় হয়। পূর্ব্বে উভয়ের মধ্যে দূরে দূরে থাকিয়া লেখার মধ্য দিয়া উভয়ের সহিত উভয়ের পরিচয় হইয়াছিল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বঙ্কিমচন্দ্র নাগোয়াতে বদলী হইয়া গেলেন। নাগোয়া মেদিনীপুর জেলায়। কাঁথির নিকটেই নাগোয়া, পূর্ব্বে এই স্থানেই মহকুমা অবস্থিত ছিল ; পরে স্থানটি অস্বাস্থ্যকর বিবেচিত হওয়ায়, মহকুমা কাঁথিতে উঠিয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র নাগোয়া মহকুমার হাকিম হইয়া আসিলেন।

এই স্থান হইতে সমুদ্র বড় বেশী দূর নহে। অবসর পাইলেই বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্র দর্শনে যাইতেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইয়াছে। অবশেষে ১৮৬০ সালের জুন মাসে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

নাগোয়ায় অবস্থান কালে একবার বঙ্কিমচন্দ্র রাজকার্য্যোপলক্ষে মফঃস্বলে গিয়াছিলেন। গ্রামের জমিদারের বাগান বাড়ীতে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। আহারাদির আয়োজন হইতেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র একটা ঘরে বসিয়া লেখাপড়ায় ব্যাপৃত ছিলেন। রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছিল। এমন সময়ে এক শুভ্রবসনাবৃতা স্ত্রীলোক ধীরে ধীরে আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। বঙ্কিমচন্দ্র এইরূপ স্থলে স্ত্রীলোকটিকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে ?" স্ত্রীলোকটি কোনও উত্তর করিল না। বঙ্কিমচন্দ্র আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি

কে? কি চাও তুমি?" স্ত্রীলোকটি তথাপি কোনও কথা বলিল না। বঙ্কিমচন্দ্র এইবার তাঁহার আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং রমণীর দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কে? কথা বলিতেছ না কেন? তুমি কি মানুষ, না পেত্নী?"

বঙ্কিমচন্দ্রকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া রমণী দরজা দিয়া বাহির হইয়া বাগানে যাইয়া দাঁড়াইল। বঙ্কিমচন্দ্রও তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গেলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন রমণীর নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন রমণী ধীরে ধীরে বাতাসের মধ্যে মিলাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অতঃপর তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ভৃত্যকে আদেশ করিলেন,— "আমি এখনই এইস্থান ত্যাগ করিব,—পাল্কী প্রস্তুত কর।"

এই নাগোয়াতে অবস্থানকালে আর একটি কাণ্ড ঘটিয়াছিল। এই স্থানে একজন কাপালিক সন্ন্যাসী গভীর রাত্রে মধ্যে মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিত। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে ভয় প্রদর্শন করা সত্ত্বেও সে দেখা করিতে আসিতে ছাড়িত না। যখন বঙ্কিমচন্দ্র সমুদ্রতীরে চাঁদপুর বাংলায় বাস করিতেন, তখন এই কাপালিক প্রত্যহ গভীর রাত্রে আসিয়া দেখা দিত। চাঁদপুরের কিছু দূরে গভীর বন ছিল। কাপালিক সেই বনে সমুদ্রতীরে বাস করিত। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" নামক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র যে কাপালিকের চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা এই কাপালিককে অবলম্বন করিয়াই লিখিত হইয়াছিল।

নাগোয়াতে বঙ্কিমচন্দ্র বেশী দিন ছিলেন না। কয়েক মাস থাকিয়া ১৮৬০ সালের নভেম্বর মাসে খুলনায় বদলী হইলেন এবং তাঁহার বেতন একশত টাকা বৃদ্ধি পাইল। চাকরীতে নিযুক্ত হইবার দুই বৎসরের মধ্যে এইরূপ পদোন্নতি সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

খুলনা তখন যশোহরের একটি মহকুমা ছিল, তখনও স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয় নাই।

খুলনায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ঘোর অরাজকতার মধ্যে পড়িলেন। একদিকে নীলকরদিগের অমানুষিক নিষ্ঠুর অত্যাচার অপর দিকে দস্যু তস্করের উপদ্রব। নীলকরদের অত্যাচার তখন চরমে উঠিয়াছিল, তাহারা এক একজন প্রতাপশালী বড় বড় জমিদার অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী। এক একজন নীলকর সাহেবের অধীনে শত শত লাঠিয়াল ছিল। এই লাঠিয়ালদিগকে লইয়া তাহারা এক একদিন আসিয়া গ্রাম আক্রমণ করিত, প্রজাদিগকে মারপিট করিত, অনেক নিরীহ প্রজা তাহাদের আক্রমণে নিহত ও আহত হইত, অনেকের বাড়ীঘর লুঠ করিয়া আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হইত, অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোককে তাহারা ধরিয়া লইয়া যাইত। যে সকল প্রজারা নীলের চাষ করিতে স্বীকৃত হইত না, নীলকরদিগের হস্তে তাহারা চরম দুর্গতি ভোগ করিত।

মরেল সাহেব নামে একজন নীলকর ছিল। তাহার প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য ছিল অপরিসীম। সে একটা নগর বসাইয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল 'মরেলগঞ্জ'। মরেল সাহেবই ছিল

এই নগরের রাজা। তাহার কিছু সৈন্যও ছিল, লাঠিয়ালের সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত। মরেল সাহেবের অধিকাংশ সম্পত্তি ছিল যশোহর জেলায়। এই মরেলগঞ্জ ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের এলাকাধীন। বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় আসিয়া দেখিলেন, মরেল সাহেবের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, সে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের খুলনায় আসিবার প্রায় একবৎসর পরে মরেল সাহেব ভয়ঙ্কর একটা দাঙ্গা বাঁধাইয়া বসিল। ১৮৬১ সালের নভেম্বর মাসে মরেল সাহেবের বহু লাঠিয়াল আসিয়া বড়খালি গ্রাম আক্রমণ করিল। সেই আক্রমণের ফলে বড়খালি গ্রাম ভস্মীভূত হইয়া গেল, অনেক নিরীহ প্রজা আহত ও নিহত হইল, বহু সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল, অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক আক্রমণকারীদের হস্তে বন্দী হইল। সুন্দর গ্রামখানি শ্মশানে পরিণত হইয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র এই কথা শুনিয়া স্বয়ং পুলিশ লইয়া তদন্ত করিতে আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, সাহেবেরা সকলেই পলায়ন করিয়াছে। ধরা পড়িল তাহাদের কয়েকজন বাঙ্গালী লাঠিয়াল। বঙ্কিমচন্দ্র তদন্ত করিয়া সাহেবদের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়া আসামীদের বিচারের জন্য মোকদ্দমা যশোহরে পাঠাইয়া দিলেন। বিচারে এক জনের ফাঁসীর হুকুম এবং চৌত্রিশ জন আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন দীপান্তর বাসের দণ্ডাদেশ হইল। সাহেবদিগের মধ্যে কেহ কেহ আত্মগোপন করিয়া বিলাতে পলায়ন করিল, কেহ কেহ ছদ্মবেশ ধরিয়া নানাস্থানে পলাইয়া রহিল।

সাহেবেরা যখন পলাতক, তখন খুলনায় প্রচারিত হইল যে যে ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্রকে মারিয়া ফেলিতে পারিবে তাহাকে একলক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে। একজন সাহেব এক পকেটে রিভলবার ও অন্য পকেটে একলক্ষ টাকার নোট লইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। সে রিভলবার এবং এক লক্ষ টাকা বঙ্কিমচন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল,—"তুমি কোন জিনিষটি চাও? অর্থ না মৃত্যু? যদি তুমি টাকা লইতে স্বীকৃত না হও, তবে তোমাকে হত্যা করিব।"

বঙ্কিমচন্দ্র ভাবিয়া উত্তর করিলেন,—"আমার স্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর দিব।"

বঙ্কিমচন্দ্র উঠিয়া পার্শ্বের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ভৃত্যদিগকে ডাকিতে লাগিলেন। সাহেব তখন পলাইয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্রের আপ্রাণ চেষ্টায় খুলনা শান্তভাব ধারণ করিল, কিন্তু তখনও যশোহর জেলার অন্যান্য মহকুমায় নীলকরদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন সমান ভাবেই চলিতেছিল।

খুলনায় অবস্থানকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস রচনা করেন।

যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রেন্‌ব্রিজ সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের কার্য্য-দক্ষতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার একশত টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া তাঁহাকে বারুইপুরে বদলী করিয়া দিলেন।

বারুইপুরে বঙ্কিমচন্দ্র বেশীদিন ছিলেন না, মাত্র সাত মাস ছিলেন। এখানে সাইক্লোনের সময় দুঃস্থ প্রজাদিগকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়া তিনি সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র বারুইপুর হইতে ডায়মণ্ডহারবারে বদলী হইয়া যান। সেখানে কিছুদিন থাকিয়া আবার তিনি বারুইপুরে ফিরিয়া আসেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে আবার তাঁহার বেতন বৃদ্ধি পাইল। এইবার তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এই সময় তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনিদেড় মাসের ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়ায় আসিলেন।

ছুটি শেষ হইলে তিনি বারুইপুরে আসিয়া কার্য্যে যোগদান করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেশীদিন এখানে থাকিতে হইল না। ১৮৬৭ সালে জুলাই মাসে তাঁহার এক নূতন চাকরী জুটিল। সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন নির্দ্ধারণের জন্য পূর্ব্ব হইতে এক কমিশন বসিয়াছিল। হাইকোর্টের জজ প্রিন্সেপ সাহেব এই কমিশনের সম্পাদক ছিলেন। তিনি বিদায় লইয়া চলিয়া যাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্থানে সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। যে পদে একজন হাইকোর্টের সাহেব নিযুক্ত ছিলেন, সেই পদে একজন বাঙ্গালীর নিয়োগ কম গৌরবের কথা নহে। এই কার্য্যে মাত্র দেড় মাস নিযুক্ত থাকিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ২৪ পরগণার সদর আলিপুরে বদলী হইয়া আসিলেন।

আলিপুরে বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র দশমাস ছিলেন। এই দশ মাসের মধ্যে তিনি তাঁহার "মৃণালিনী" উপন্যাস লিখিয়া শেষ করেন। পরে ১৮৬৮ সালের জুন মাস হইতে তিনি ছয় মাসের ছুটি লইয়া গৃহে আসিলেন, এবং কিছুদিন গৃহে থাকিয়া অবশেষে কাশী চলিয়া গেলেন। অবকাশান্তে তিনি পুনরায় আলিপুরে ফিরিয়া আসিয়া কার্য্যে যোগদান করিলেন।

১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে "মৃণালিনী" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এইবার তিনি বহরমপুরে বদলী হইয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি বি, এল্, পরীক্ষা দিয়াছিলেন, এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। তখন তাঁহার বেতন হইল সাতশত টাকা। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের জননী পরলোক গমন করিলেন। নগ্নপদে নগ্নদেহে উত্তরীয় মাত্র সম্বল করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কাছারীতে আসিয়া বসিতেন। দুই দিন মাত্র এইভাবে কাছারী করিয়াছিলেন, তাহার পর ছুটি লইয়া গৃহে গমন করেন।

গৃহে গমনের সময় নলহাটী ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া দেখেন, দুইজন সাহেব বসিয়া মদ খাইতেছে। সাহেবেরা দেখিল, একজন নগ্নপদ নগ্নদেহ বাঙ্গালী গাড়ীতে উঠিয়াছে, তাহাদের রাগের আর সীমা রহিল না। তাহারা 'উতার যাও' 'উতার যাও' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ট্রেণ তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, মহাবিপদ্ ; তিনি তখন একাকী, কিছু করিবারও সাধ্য নাই। কিন্তু তিনি সাহস হারাইলেন না। তিনি সাহেবদিগকে বলিলেন,—"চলন্ত গাড়ী হইতে কিরূপে নামিয়া যাইতে হয়, তোমরা আগে তাহা দেখাইয়া দাও।"

একজন নগ্নপদ নগ্নশরীর বাঙ্গালীর মুখে সাহেবেরা বিশুদ্ধ ইংরেজী শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু পুনরায়

তাহারা বঙ্কিমচন্দ্রকে নামিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র ভাষায় সাহেবদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। এই সময় পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গাড়ী থামিল। বঙ্কিমচন্দ্র দেখিলেন, মাতাল সাহেবদিগের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করা বৃথা। তিনি গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া যাইয়া প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিলেন।

বহরমপুরে আসিবার পর তথাকার গোরা ব্যারাকের অধিনায়ক কর্ণেল ডফিন সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাদ আরম্ভ হয়। গোরা ব্যারাকের সম্মুখ দিয়া একটা সরু সোজা পথ ছিল। সেই পথ দিয়া কেহ গমনাগমন করিলেই গোরারা আপত্তি করিত। একদিন কাছারী শেষ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র পাল্কী আরোহণে সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। কর্ণেল ডফিন আসিয়া পাল্কী গমনে বাধা দিল। বঙ্কিমচন্দ্র পাল্কী হইতে অবতরণ করিলেন। সাহেব তখন তাঁহার হাত ধরিয়া ফিরাইয়া দিল। বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষোভে ও রোষে জ্বলিতে জ্বলিতে গৃহে ফিরিলেন। পরদিন তিনি কর্ণেল ডফিনের নামে ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মান হানির মোকদ্দমা রুজু করিলেন। বহরমপুরের প্রায় দেড়শত উকীল ও মোক্তার সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করিলেন। ডফিন সাহেব বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার পক্ষ সমর্থনের জন্য কোনও উকীল বা মোক্তার সংগ্রহ করিতে পারিল না। অবশেষে সাহেব বাধ্য হইয়া মামলা মিটাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বহরমপুরের সাহেবেরা তথাকার জজ বেন্‌ব্রিজ সাহেবকে মোকদ্দমা মিটাইয়া দিবার জন্য ধরিল।

বেন্‌ব্রিজ সাহেব বলিলেন,—"কর্ণেল ডফিন বঙ্কিমবাবুকে অপমান করিয়াছে, সে যদি বঙ্কিমবাবুর নিকটে ক্ষমা চাহিতে রাজি হয়, তবে আমি মোকদ্দমা মিটাইয়া দেওয়ার জন্য মধ্যস্থতা করিতে পারি।"

ডফিন তাহাই স্বীকার করিল। কর্ণেল প্রকাশ্য আদালতে বঙ্কিমবাবুর হস্ত ধারণ করিয়া ক্ষমা চাহিল। বঙ্কিমচন্দ্র মামলা তুলিয়া লইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহরমপুরে আসিবার কয়েকমাস পরের কথা। প্রত্যেক বৎসরই মুর্শিদাবাদ নবাবের প্রাসাদে মহা সমারোহে বেরা উৎসব সম্পন্ন হইত। এই উৎসবে সাহেব ও অন্যান্য গণ্যমান্য বাঙ্গালীদের নিমন্ত্রণ হইত। কিন্তু নিমন্ত্রিত সাহেব-দিগের প্রতি যে প্রকার সম্মান ও আদর প্রদর্শিত হইত, নিমন্ত্রিত বাঙ্গালীদের প্রতি সেরূপ করা হইত না।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আসিয়া নবাব প্রাসাদের এই উৎসব ও আদর আপ্যায়নের গল্প শুনিয়াছিলেন। সেবার যখন উৎসবের সময় আসিল, নবাবের জনৈক কর্ম্মচারী বঙ্কিমচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন,—"আপনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছেন ভাল কথা।" কিন্তু আমি শুনিতে পাইলাম, আপনারা সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তির প্রতি সমান সম্মান ও আদর অভ্যর্থনা প্রদর্শন করেন না। কেবল সাহেব সুবাদিগের প্রতিই আদর আপ্যায়ন সমধিকভাবে বর্ষিত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় আমি আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারি না।

কর্ম্মচারীটি বিস্মিত হইয়া কার্ড ফিরাইয়া লইয়া গেল এবং

নবাব ও দেওয়ানের নিকট সমস্ত কথা বলিলে। নবাব ও দেওয়ান সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। নবাব পুনরায় দেওয়ানকে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট পাঠাইলেন। দেওয়ান আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিলেন,—"আমাদের ত্রুটি হইয়াছে, ভবিষ্যতে আর এরূপ হইবে না, সাহেবরা যেরূপ সম্মান ও আপ্যায়ন পাইয়া থাকেন, বাঙ্গালীরাও তদ্রূপ পাইবেন।"

বলা বাহুল্য এই কথায় বঙ্কিমচন্দ্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। উৎসবে সকল নিমন্ত্রিত ব্যক্তিই সমানভাবে অভ্যর্থিত ও আদৃত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে থাকার সময়ে একবার তদানীন্তন ছোটলাট স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বহরমপুর পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাজকর্ম্ম দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"তুমি ষ্টীমারে যাইয়া আমার সহিত দেখা করিও।" সাহেব একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লাট সাহেবের জাহাজ 'রোটাস্' তখন মাঝ গঙ্গায় বাঁধা ছিল। তথায় পৌঁছিতে হইলে নৌকাই একমাত্র সম্বল। বঙ্কিমচন্দ্র ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নৌকায় উঠিবার আয়োজন করিতেছেন। তিনিও লাট দর্শনে যাইতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের নৌকায় উঠিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সাহেবের ইচ্ছা নয় যে, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এক নৌকায় যান। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের মনোভাব বুঝিয়া কহিলেন, "আপনাকে রাখিয়া নৌকা ফিরিয়া আসিতে অনেক

বিলম্ব হইয়া যাইবে, তাহা হইলে আমি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছোটলাট সাহেবের সহিত দেখা করিতে পারিব না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আর কোনও আপত্তি না করিয়া বলিলেন,—"কিন্তু আগে আমি ছোটলাট সাহেবের কাছে কার্ড পাঠাইব।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা যাইয়া রোটাস্ ষ্টীমারে লাগিল। পূর্ব্বকথামত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবই প্রথমে কার্ড পাঠাইলেন।

ছোটলাট সাহেব সম্ভবতঃ জাহাজের গবাক্ষ-পথ দিয়া আগন্তুকদের দেখিয়া থাকিবেন। তিনি কার্ড পাইয়া কার্ডের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলেন,—"তুমি এক্ষণে অপেক্ষা কর, আগে ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্রকে পাঠাইয়া দাও।"

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্ড প্রত্যাখ্যান করিয়া বঙ্কিমবাবুকে আগে আহ্বান করা,—এই সম্মান বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে কম নয়।

বহরমপুরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গীয় খ্যাতনামা রমেশচন্দ্র দত্তের একবার সাক্ষাৎ হয়। রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' এবং তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকা, 'বঙ্গদর্শন' পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া বলিলেন,—"বাঙ্গালা ভাষা এত সুন্দর হইতে পারে, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না।"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন,—"বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি তোমার যদি এতই অনুরাগ হইয়া থাকে, তবে তুমি বাংলা লেখ না কেন?"

রমেশ বাবু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"আমি বাংলা লিখিব?

আমি জীবনে কখনও বাংলা লিখি নাই—লিখিবার প্রণালীও জানি না।”

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন,—“লিখিবার প্রণালী আবার কি? তোমরা শিক্ষিত ব্যক্তি, যে ধারায় লিখিবে, সেই ধারাই হইবে প্রণালী।”

বঙ্কিমবাবুর কথাটা বোধ হয় রমেশচন্দ্রের মনে লাগিয়াছিল। তাই এই ঘটনার পর দুই বৎসরের মধ্যে রমেশচন্দ্রের উপন্যাস “বঙ্গ-বিজেতা” প্রকাশিত হইল।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শারীরিক অসুস্থতার জন্য ছুটি লইয়া তিনি বহরমপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

বিদায়কালে স্থানীয় অধিবাসীরা বিরাটভাবে তাঁহার বিদায় সংবর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিল। সাতদিন ধরিয়া এই উৎসবানুষ্ঠান বিপুলভাবে চলিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে অবস্থানকালে বেশ সুখে ছিলেন। ধন, মান, যশ, প্রতিপত্তি সমস্তই তিনি পাইয়াছিলেন। এখানে আসিবার পূর্ব্বে তাঁহার তিনখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল, সুতরাং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে তাঁহার যশ-সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল

চার

ছুটির অবসানে বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বারাসতে আসিলেন। সেখানে অতি অল্প সময় থাকিয়া তিনি মালদহে বদলী হইয়া গেলেন। কিন্তু সেখানকার জলবায়ু তাঁহার সহ্য হইল না। কয়েক মাস পরেই তিনি নয় মাসের ছুটি লইয়া কাঁটালপাড়ায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

গৃহে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র "রাধারাণী" এবং "কৃষ্ণকান্তের উইল" লিখিতে লাগিলেন। "বঙ্গদর্শন" তখন পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে উহার সম্পাদক ছিলেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলী হইলেন। কাঁটালপাড়া হইতে হুগলী এক ঘণ্টার পথও নয়, সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম প্রথম কিছুদিন কাঁটালপাড়া হইতেই হুগলীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন" তুলিয়া দিয়া সপরিবারে চুঁচুড়ায় যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

দরিদ্রের দুঃখে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় বরাবরই গলিয়া যাইত। এই সম্বন্ধে একটা গল্প আছে। চুঁচুড়ায় যজ্ঞেশ্বর তলায় প্রতি বৎসর খুব জাঁক জমকের সহিত মেলা বসিত। বহুলোক সেই মেলা দেখিতে যাইত। গঙ্গার এপার হইতেও বহুলোক নৌকারোহণে মেলা দেখিতে যাইত। একদিন বঙ্কিমচন্দ্র গৃহ হইতে দেখিলেন, একজন মাঝি তাহার নৌকায় লোক তুলিতেছে, নৌকায় তিল ধরণের স্থান নাই, তথাপি মাঝি

নৌকায় লোক লইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে আর লোক লইতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু মাঝি সেই নিষেধ না শুনিয়া নৌকায় যত লোক ধরে তাহা তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু কতকদূর গিয়াই নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। সেখানে অল্প জল ছিল বলিয়া কোনও জীবনহানি ঘটিল না। ডাঙ্গা নিকটে ছিল, মাঝিরা নৌকা টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিল। বঙ্কিমচন্দ্র তৎক্ষণাৎ মাঝিকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিলেন। পুলিশ মাঝির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা রুজু করিল।

বিচারে মাঝির তিনমাস কারাদণ্ডের আদেশ হইল। কিন্তু কারাবাস অন্তে মাঝি আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিল না। কারাগারেই তাহার মৃত্যু হইল।

মাঝির মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া বঙ্কিমবাবু হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইলেন। তিনি মাঝির বিধবা পত্নীর ভরণ পোষণের জন্য একটা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মাঝির বিধবা পত্নী যতদিন জীবিত ছিল ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে মাসে মাসে সেই বৃত্তির টাকা পাঠাইয়া দিতেন।

হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্র পাঁচ বৎসর ছিলেন। এই সময় মান, সম্ভ্রম, অর্থাগম যথেষ্টই হইয়াছিল। হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট বঙ্কিম-চন্দ্রের উপর জেলার ভার ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। বিভাগীয় কমিশনার তাঁহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের পার্সন্যাল এ্যসিণ্ট্যাণ্ট করিয়া লইয়াছিলেন।

পুস্তক-বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রচুর পরিমাণে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল। আবার "বঙ্গদর্শন" প্রকাশিত

হইল। "কমলাকান্তের দপ্তর", "রাজসিংহ", "মুচিরামগুড়ের জীবন-চরিত", "আনন্দমঠ" প্রভৃতি লিখিত হইয়া বঙ্গদর্শনে একে একে প্রকাশিত হইতে লাগিল। "আনন্দমঠ" বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার অল্পকাল পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী পরিত্যাগ করেন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী হইতে হাওড়ায় বদলী হইয়া আসিলেন।

হাওড়ায় আসিবার পর তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট বক্‌লণ্ড সাহেবের সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র পুলিশ চালানি মোকদ্দমাগুলি প্রায়ই ছাড়িয়া দিতেন, এই জন্যই তাঁহার উপর সাহেবের রাগ। সাহেবের এই ক্রোধ ক্রমশ জমাট বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। পরে কোনও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে এই বিরোধ মিটিয়া যায় এবং বক্‌লণ্ড সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট হিতৈষী বন্ধুরূপে পরিগণিত হন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন। চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ২৫ বৎসর পেন্‌স্‌ন ভোগ করিয়াছিলেন।

চারি ভ্রাতায় মিলিয়া মহাসমারোহে পিতার শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা করিলেন।

পিতার মৃত্যুর কিছুকাল পরে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই কার্য্য তাঁহাকে বেশী দিন করিতে হয় নাই।

ইহার পর বঙ্কিমচন্দ্র বদলী হইয়া আলিপুরে আসিলেন। কিন্তু তিন মাস পরেই বদলী হইয়া বারাসতে গেলেন। সেখানেও তিন মাসের বেশী থাকিতে হইল না। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি যাজপুরে বদলী হইলেন।

যাজপুরে বঙ্কিমচন্দ্র ছয় মাস মাত্র ছিলেন। সেখান হইতে যখন তিনি ফিরিতেছিলেন, তখন রেলপথ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র পাল্কী চড়িয়া আসিতেছিলেন, সঙ্গে ছিলেন তাঁহার মধ্যম জামাতা। তিনি আসিতেছিলেন পশ্চাতে স্বতন্ত্র পাল্কীতে। পথ বড়ই দুর্গম ও ভয়সঙ্কুল, বনের মধ্যে দিয়া বহুদূর আসিতে হয়। ভৃত্যাদি তাঁহাদের সঙ্গে ছিল না, তাহারা মালপত্র লইয়া ভিন্ন পথে আসিতেছিল। সঙ্গে ছিল মাত্র দুই জন লোক, তাহারা লণ্ঠন লইয়া পাল্কীর সঙ্গে আসিতেছিল।

রাত্রিকাল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছে। পথ একেবারে জনশূন্য। সেই জনশূন্য পথে পাল্কী চলিয়াছে। পাল্কীর যোলজন বাহক, তাহারা উড়িয়্যাবাসী। মাঘ মাস, তাই শীতও ছিল কন্‌কনে। সহসা পথে কয়েকজন লাঠিধারী লোক দেখা গেল। পাল্কী-বাহকেরা তাহা দেখিয়া ভয় পাইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর পাল্কী নামাইল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। পাল্কী ভূপৃষ্ঠ হওয়াতে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হয়েছে রে?"

বাহকেরা তখন সকলেই পলায়ন করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র পাল্কী হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, লাঠিধারী পনর যোলজন লোক তাঁহার পাল্কী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের হাতে

লাঠি ব্যতীত অন্য অস্ত্র নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন ইহারা ডাকাত।

বঙ্কিমচন্দ্র একখানা লাঠি হাতে পাল্কী হইতে নামিয়া পথে দাঁড়াইলেন এবং লাঠি উঠাইয়া সম্মুখস্থ দস্যুকে বলিলেন, —"এখনই সরিয়া যা, নতুবা সকলকে গুলি করিয়া মারিব।" এতগুলি বলিষ্ঠকায় দস্যুর সম্মুখে একাকী বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভীক-ভাবে দাঁড়াইয়া, তাঁহার অন্তরে ভয়ের লেশ মাত্র নাই। দস্যুরা কি ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

এই সময়ে হিষ্টি সাহেবের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের ভয়ানক মসীযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। উভয়ের পত্রাবলীই নিয়মিত ভাবে 'ষ্টেটস্‌ম্যান্‌' পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। কি ইংরেজ কি বাঙ্গালী সেই পত্রসমূহ বিশেষ আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে লাগিল।

ঘটনাটি ঘটিয়াছিল শোভাবাজার রাজ বাড়ীর শ্রাদ্ধ ব্যাপার লইয়া। হিষ্টি সাহেব হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার লইয়া গালি পাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের তাহা সহ্য হইল না, তাই তিনি উহার প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। উভয়ের সেই পত্রাবলী সমগ্র দেশে এক তুমুল আগ্রহের সৃষ্টি করিয়া-ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সেই পত্রগুলি এমন সুন্দর ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল যে, সকলেই তাহা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই পত্রের বিশুদ্ধ ইংরাজী ও পাণ্ডিত্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"এই পত্রগুলি কি সত্য সত্যই বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা।"

বঙ্কিমচন্দ্র যাজপুর হইতে বদলী হইয়া দ্বিতীয়বার হাওড়ায় আসিলেন।

পাঁচ

বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়ায় আসিবার কিছুদিন পরেই তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্ট্ ম্যাকট সাহেবের সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হইল। বিবাদ আরম্ভ হইল একটি রেলওয়ে ব্যাপার লইয়া। বঙ্কিমচন্দ্রের কোর্টেই মামলাটি চলিতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মোকদ্দমাটির ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট যে দিন শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারে আসামীরা সকলেই খালাস পাইয়াছে, তখন তাঁহার তাহা সহ্য হইল না। তিনি ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট হইয়া বঙ্কিমচন্দ্রের এজলাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন অন্য একটি মামলার বিচার করিতেছিলেন। সাহেব এজলাসের নীচে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বঙ্কিম বাবু, আপনি রেলওয়ে মোকদ্দমার আসামীদিগকে খালাস দিয়াছেন!"

বঙ্কিমচন্দ্র চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন না, বসিয়াই উত্তর করিলেন,—"কি হইয়াছে তাহাতে?

সাহেব বলিলেন,—"আসামীদিগকে আপনার সাজা দেওয়া উচিৎ ছিল।"

বঙ্কিম বলিলেন,—"আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা

আদালতের অপমানজনক। আমি আপনার এই অন্যায় আচরণের বিষয় উপরে লিখিয়া জানাইতেছি।”

এই বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবের বিরুদ্ধে লিখিতে লাগিলেন। সাহেব দেখিলেন, মহাবিপদ্! এই নেটিভ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটটি সহজ পাত্র নহেন, তিনি এরূপ দৃঢ়চেতা হইবেন তাহা আশা করিতে পারেন নাই। সাহেব মনে মনে বুঝিলেন, কাজটা খুবই অন্যায় হইয়াছে। তখন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবকে অব্যাহতি দিলেন।

সাহেবের কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপর রাগ পড়িল না। তিনি নানাভাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে বেগ দিতে লাগিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বাসা ছিল তখন কলিকাতায়, তিনি কলিকাতা হইতে হাওড়ায় যাইয়া কোর্ট করিতেন। সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে আদেশ দিলেন, তাঁহাকে হাওড়ায় বাসা করিয়া থাকিতে হইবে। নানা অসুবিধা সত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত বিবাদ আরম্ভ হওয়ার তিনমাস পরেই ওয়েষ্ট্ ম্যাকট সাহেব অন্যত্র বদলী হইয়া গেলেন। নতুবা হয়ত তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে আরও নানাভাবে বেগ দিতেন।

হাওড়ায় দুই বৎসর থাকিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। তখন তাঁহার বেতন হইল মাসিক আটশত টাকা। তখন তাঁহার পুস্তকের আয়ও যথেষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র এইবার যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমায় বদলী হইলেন। কিন্তু বেশী দিন তথায় থাকিতে পারিলেন না;

জ্বরে কাতর হইয়া তিন মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ছুটি শেষ হইলে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে বঙ্কিমচন্দ্র ভদরকে বদলী হইয়া গেলেন। ভদরক উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর জেলার একটি মহকুমা।

ভদরকে বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র একমাস ছিলেন। তথা হইতে হাওড়ায় ফিরিয়া আসিলেন। হাওড়ায় আসিয়া তিনি ছয় মাসের ছুটি লইলেন। ছুটির পরে গেলেন মেদিনীপুরে। সেখানে ছয়মাস মাত্র থাকিয়া চারিমাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। অবকাশান্তে তিনি আলিপুরে বদলী হইলেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র আলিপুরে গেলেন। আলিপুরে আসিয়া তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সহিত নানা ব্যাপার লইয়া মতান্তর ঘটিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র মনস্থ করিলেন, আর তিনি চাকরী করিবেন না, পেন্‌সন্ লইবেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পেন্‌সনের দরখাস্ত করিলেন। কিন্তু সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হইল না। তাঁহার বয়স মাত্র তিপ্পান্ন বৎসর, পঞ্চান্ন বৎসরের পূর্ব্বে পেন্‌সন্ লইবার উপায় নাই।

উপায়ান্তর না দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অবশেষে বঙ্গের ছোট লাট ইলিয়ট সাহেবের সহিত দেখা করিলেন। ইলিয়ট সাহেব ও তাঁহার পত্নী বঙ্কিমচন্দ্রকে খুব ভালবাসিতেন। ইলিয়ট সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের পেন্‌সন্ মঞ্জুর করিলেন।

তেত্রিশ বৎসর একমাস চাকরী করার পর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের

১৪ই সেপ্টেম্বর বঙ্কিমচন্দ্র পেন্‌সন্‌ গ্রহণ করিলেন। মাসিক চারি শত টাকা তাঁহার পেন্‌সন্‌ মঞ্জুর হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের পুস্তকের আয়ও তখন নিতান্ত অল্প নহে, বার্ষিক প্রায় ছয় হাজার টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন, অবসর গ্রহণ করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াই সময় কাটাইবেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হইয়া উঠে নাই। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি মাত্র তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি এই তিন বৎসরের মধ্যে একখানি পুস্তকও লেখেন নাই। কেবল 'ঢেঁকি' নামক একটা নূতন প্রবন্ধ কমলাকান্তের দপ্তরের দ্বিতীয় সংস্করণে সংযোজিত করিয়াছিলেন। আর আনন্দমঠ, রাধারাণী, যুগলাঙ্গুরীয়, কৃষ্ণচরিত ও কৃষ্ণকান্তের উইলের এক একটা নূতন সংস্করণ করিয়াছিলেন। রাজসিংহ ও ইন্দিরা বর্ত্তমান আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র একখানি সামাজিক উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকটি পরিচ্ছেদ শেষ করিয়াছিলেন মাত্র, সম্পূর্ণ লিখিয়া যাইতে পারেন নাই।

অবসর লইয়া বঙ্কিমচন্দ্র একটি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তখন ঐ সভার নাম ছিল Society for the higher training of young men. এখন উহার নাম হইয়াছে University Institute (ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট) বঙ্কিমচন্দ্র এই সভায় সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহা শরীরের উন্নতি সম্বন্ধীয় এবং উপনিষদ সম্বন্ধীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুকাল অবধি তাহার সভ্য ছিলেন।

কিন্তু সভায় বড় বেশী যাইতেন না। যখন যাইতেন তখন তিনি কোনও পক্ষে যোগদান না করিয়া স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতেন। খোসামোদ কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকালের জন্য মাছমাংস ত্যাগ করিয়া হবিষ্যাশী হইয়াছিলেন। গায়ে নামাবলী দিতেন, শুদ্ধাচারে থাকতেন, সতত গীতা আবৃত্তি করিতেন। কিন্তু যিনি পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া মাছমাংস খাইয়া আসিয়াছেন,তাঁহার শরীরে হবিষ্যান্ন সহ্য হইল না। তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন, অবশেষে চিকিৎসকগণের পরামর্শে তাঁহাকে পুনরায় আমিষ আহার ধরিতে হইল।

ছয়

বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি ঘোড়ার গাড়ী ছিল। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় দৌহিত্রদের লইয়া গাড়ীতে চড়িয়া বেড়াইতে যাইতেন। ১৩০০ সালের কার্ত্তিক মাসের এক অপরাহ্লে সকলে বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তখন একজন সন্ন্যাসী আসিয়া বাড়ীর সদর দরজায় দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহেন, কিন্তু দ্বারোয়ান কিছুতেই তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দিতেছে না। সন্ন্যাসী তখন নিরস্ত হইয়া পথের এক ধারে যাইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে বঙ্কিমচন্দ্র ছেলেদের লইয়া বাহিরে আসিলেন। গাড়ী বড় রাস্তায় অপেক্ষা করিতেছিল, গলিটুকু হাঁটিয়া যাইয়া গাড়ীতে উঠিতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র গলির উপর আসিয়া

দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ নয়নে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একবার সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই অগ্রসর হইলে সন্ন্যাসী উঠিয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"খাড়া হো"—(দাঁড়াও)।

বঙ্কিমচন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসী হিন্দী ভাষায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম বঙ্কিমচন্দ্র ?"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন,—"হাঁ।"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"তোমার জন্য আমি নেপাল হইতে আসিয়াছি,—ফিরিয়া আইস, কথা আছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র যেন সন্ন্যাসীর নিকট কিরূপ হইয়া গেলেন, তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বালকের ন্যায় সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় ফিরিলেন এবং সসম্মানে সন্ন্যাসীকে অভ্যর্থনা করিয়া উপরের ঘরে লইয়া গেলেন।

উপরে যাইয়া নাকি সন্ন্যাসী বঙ্কিমচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"আমার গুরু নেপালে থাকেন, তিনি আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন। তুমি ও আমি পূর্ব্বজন্মে এক গুরুর মন্ত্র-শিষ্য ছিলাম। আমরা উভয়ে একসঙ্গে যোগসাধন করিয়াছিলাম। তোমার কর্ম্মফল তোমাকে সংসারে টানিয়া আনিল। আমি সন্ন্যাসী হইয়া আমার পূর্ব্বজন্মের গুরুকে পাইলাম।"

সন্ন্যাসীর বয়স বেশী নহে। সন্ন্যাসীজনোচিত তাঁহার কোনও আড়ম্বরও ছিল না, তাঁহার জটা বা ভস্মের ঘটা ছিল না, হাতে চিমটাও ছিল না, কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল প্রফুল্ল এবং শরীর তেজোদীপ্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"গুরুদেব আপনাকে পাঠাইয়াছেন কেন ?"

সন্ন্যাসী বলিল,—"সেকথা আর একদিন বলিব। আজ এই রুদ্রাক্ষটি লও। যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে প্রত্যহ ইহার পূজা করিও।"

সন্ন্যাসী আরও কিছু উপদেশ দিয়া বিদায় লইলেন। তিনি বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ করিলেন না বা কিছু ভিক্ষাও লইলেন না।

তিন মাস পরে সন্ন্যাসী আবার আসিলেন। তখন ছিল মাঘ মাস, দারুণ শীত। মধ্যাহ্নকালে সন্ন্যাসী আসিলেন। সেবার তাঁহাকে কেহ বাধা দিল না। তিনি সোজা উপরে উঠিয়া গেলেন।

তথায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র উপস্থিত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিলেন। দুই চারিটি কথার পর সন্ন্যাসী বললেন,—"বঙ্কিমচন্দ্র, এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে হইবে তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছ ?"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন,—"না ভুলি নাই।"

সন্ন্যাসী কহিলেন,—"তবে প্রস্তুত হও।"

বঙ্কিমচন্দ্র দৌহিত্রকে উঠিয়া যাইতে বলিলেন। বালক কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। তখন বঙ্কিমচন্দ্র দ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কথা বলিতে লাগিলেন। প্রায় তিন চার ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিল। কিন্তু কি কথা হইল তাহা কেহ জানিতে পারিল না। বঙ্কিমচন্দ্রও সে কথা কাহাকেও কোনও দিন বলেন নাই।

সাত

মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বঙ্কিমচন্দ্র বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু তাহা বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই, বড় একটা চিকিৎসাও করাইতে হয় নাই।

১৩০০ সালের শীতকালে সহসা রোগ বৃদ্ধি পাইল। তখন তাঁহার চিকিৎসার প্রস্তাব উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন,—"চিকিৎসা করাইতে চাও, করাও,—আমি তোমাদের মনে কোনও আক্ষেপ রাখিতে দিব না।"

চিকিৎসা চলিতে লাগিল; কিন্তু রোগের উপশম না হইয়া রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে চৈত্র মাসের প্রথমে তিনি শয্যা গ্রহণ করিলেন।

বহুমূত্র রোগ সাধারণতঃ স্ফোটক বা ব্রণ উৎপাদন না করিয়া ছাড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্রেরও তাহাই হইল। তাঁহার একটি স্ফোটক জন্মিল। কলিকাতার বড় বড় চিকিৎসকেরা প্রায় সকলেই চিকিৎসার জন্য আহুত হইলেন।

তৎকালীন বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ও'ব্রায়েন সাহেব বলিলেন,—"স্ফোটকটি অবিলম্বে অস্ত্র করিতে হইবে।" অন্যান্য চিকিৎসকেরাও তাহাতে মত দিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে ঘোর আপত্তি করিলেন। তিনি বলিলেন,—"এ যাত্রা কিছুতেই আমার নিস্তার নাই; অস্ত্রাঘাত কর আর না কর, কিছুতেই আমার পরিত্রাণ নাই। তবে কেন অনর্থক অস্ত্রোপচার করিয়া আমার যন্ত্রণা বৃদ্ধি কর।"

কাজেই ও'ব্রায়েন সাহেব অস্ত্র করিতে বিরত থাকিলেন।

দুই এক দিনের মধ্যেই স্ফোটকটি ফাটিয়া গেল। ও'ব্রায়েন বলিলেন,—"এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন,—আর কোনও ভয় নাই।"

দুই তিন দিন পরে পুরাতন স্ফোটকের পার্শ্বে আর একটি নূতন স্ফোটক দেখা দিল। সেবারও অস্ত্রোপচার করা হইল না। কিন্তু ফল তেমন সন্তোষজনক হইল না। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী।

বঙ্কিমচন্দ্রের অবস্থা ক্রমেই শঙ্কটাপন্ন হইয়া আসিল। আত্মীয় স্বজনেরা অনেকেই তাঁহাকে দেখিতে আসিল। বাড়ী লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। অবশেষে ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র রবিবার বেলা ৩টা ২৩ মিনিটের সময় বঙ্কিমচন্দ্র ৫৫ বৎসর ৯ মাস ১৪ দিন বয়সে ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে মহাপ্রস্থান করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ মুহূর্ত্তমধ্যে চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বহুলোক তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

একখানি সুন্দর খাটের উপর শয্যা বিস্তৃত হইল, সেই শয্যা কুসুমদামে সজ্জিত করা হইল। তাহার পর তাঁহার মৃতদেহ ত্রিতল হইতে আনিয়া সেই পুষ্পাস্তৃত খাটে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। বঙ্কিমচন্দ্রের মুখমণ্ডলে কোনও কষ্ট চিহ্ন নাই,—কোনও বিকার নাই। অপূর্ব্ব শান্তি, চিরপ্রফুল্লতা তাঁহার বদনমণ্ডল প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। যেন তিনি নিদ্রিত,—যেন তিনি কোনও সুখময় রাজ্যের স্বপ্ন দেখিতে ছিলেন।

পরে তাঁহাকে নিমতলা শ্মশান ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়।

পথে বহুলোক সেই শব-যাত্রায় যোগদান করে। ক্রমে তাহা বিরাট একটি শোভাযাত্রায় পরিণত হয়। বহুলোক শবের উপর কুসুমরাশি প্রদান করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রদর্শন করিতে থাকে।

ইহার পূর্ব্বে আর মৃত সাহিত্যিকের প্রতি এমন করিয়া সম্মান প্রদর্শিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্মান দেখাইয়া বাঙ্গালী জাতি নিজেকে সম্মানিত করিল।

অতঃপর চিতাবহ্নিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেহাবশেষ ভস্মীভূত হইয়া ভস্মরাশি জাহ্নবীর পবিত্র সলিল-প্রবাহে মিশিয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষয় অমর হইয়া বাঁচিয়া রহিল। তাঁহার বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত আজও কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে অপূর্ব্ব দেশপ্রেম এবং উন্মাদনার সৃষ্টি করিতেছে, তাঁহার অমর উপন্যাস রাজি আজিও বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সম্পদ্, বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব ভাষা আজও বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের অনুকরণীয়।

যাও, বঙ্কিমচন্দ্র, আবার আসিও। বাঙ্গালী যখন 'সপ্তকোটি কণ্ঠে কলকল নিনাদে' তোমাকে ডাকিবে, তখন আবার আসিও, আবার বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইও।

আট

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুতে সমগ্র বাংলা দেশের নয়নে অশ্রুধারা বহিল। নানা স্থানে শোকসভা আহুত হইতে লাগিল। কলিকাতা

টাউন হলে যে বিরাট শোকসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে আসামের তৎকালীন চিফ্‌-কমিশনার কটন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালার সমুজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল।" সংবাদপত্রে, সাময়িকপত্রেও শোক প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবি গোবিন্দ দাস, নব্য ভারত পত্রিকার সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতি শোক গাথা রচনা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

রবীন্দ্রনাথ লিখিলেন,—

"যে সকল রাজ্যে মহত্ত্ব বিরল নহে, সেখানে কোন যশস্বী লোকের অন্তর্দ্ধান হইলে সমস্ত দেশ শোক করিতে থাকে। আমাদের এই দুর্ভাগ্য দেশে শুভ দৈববশে কদাচিৎ ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তথাপি জীবনের কার্য্য সমাধা করিয়া যখন তাঁহারা সংসার-ক্ষেত্র হইতে অন্তরিত হন, তখন এই জড়তাপন্ন দরিদ্র দেশ তাঁহাদের অভাব যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

কিন্তু একথা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না। লেখনী সহজেই লিখিতে চাহে যে, অদ্য সমস্ত বঙ্গদেশ বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগ-দুঃখে শোকাতুর।

অল্প দিনের মধ্যে আমাদের অনেকগুলি শোকের কারণ ঘটিয়াছে। প্রথমে রাজেন্দ্রলাল মিত্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি তাঁহাকে ভাল করিয়া বিদায়-সম্ভাষণ করিল না।

তারপর বিদ্যাসাগর। বঙ্গ ভাষার প্রথম স্তর তিনি নির্ম্মাণ

করিয়াছেন, বিধবার দুঃখ-মোচনের জন্য নিষ্ঠুর সমাজের সহিত তিনি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করিয়াছেন—আর যে বঙ্গদেশ তাঁহার জীবনের রক্তে জীবন পাইয়াছে সে আজ বহু কষ্টে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার উপলক্ষে দুই চারিবার সামান্য ব্যর্থ চেষ্টা দেখাইয়াই আপনাকে ঋণমুক্ত জ্ঞান করিয়া সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছে।

আজ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও আমরা সভা ডাকিয়া সাময়িক পত্রে বিলাপসূচক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছি। তাহার অধিক আর কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হয় না। প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা বা কোনওরূপ স্মরণচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানা গিয়াছে যে, চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা অধিক। উপর্য্যুপরি বারংবার অকৃতজ্ঞতা ও অনুৎসাহের পরিচয় দিলে ক্রমে আর আত্মসম্ভ্রমের লেশমাত্র থাকিবে না, এবং ভবিষ্যতে প্রবন্ধ লিখিয়া শোকের আড়ম্বর করিতেও কুণ্ঠিত বোধ করিতে হইবে।

উপকার গ্রহণ করিবার শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কৃতজ্ঞতার শক্তিও বাড়িতে থাকে। আমাদের দেশের জাতীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও সেরূপ দাঁড়ায় নাই যাহাতে আমরা কোন্ মহৎ লোকের দৃষ্টান্ত বা কার্য্য অন্তরের মধ্যে যথার্থরূপে পরিপাক করিতে পারি।

সেই জন্য যে কয়েকটি মহাত্মা আমাদের দেশের কাজে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মিশরের বিস্তীর্ণ মরুভূমির মধ্যে গুটিকতক নিঃসঙ্গ পিরামিডের মত দেখিতে হয়।

এই মৃত মরুভূমির মধ্যে তাঁহাদের সমুন্নত মহিমা দ্বিগুণ দেদীপ্যমান হয় বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সুবিশাল বিষাদ হৃদয়কে বাষ্পাকুল করিয়া তোলে। হায়, এত বড় জীবন যাহার নিকট নিঃশেষে সমর্পিত হইয়াছে, সে জানিতেও পারিল না তাহার কি সৌভাগ্য এবং সে চিরদিনের জন্য কতখানি লাভ করিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষ উপলক্ষে "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই উপাধি তাঁহার ভূষণ না হইয়া কলঙ্ক স্বরূপ হইয়াছিল। এই উপাধি বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত হয় নাই। যে উপাধি পুলিশ-ইনস্পেক্টর বা মাইনর স্কুলের শিক্ষক পায়, সে উপাধি সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের উপযুক্ত হইতে পারে না।

বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১২৯৯ সাল, শ্রাবণ সংখ্যায়) 'উপাধি-উৎপাত' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এস্থলে সেই প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল—

"সেদিনকার উপাধি-সত্র মনে পড়ে। বেলভেডিয়ারে সভাগৃহে দরবার বসিয়াছে। মহারাজা বাহাদুর, রাজা বাহাদুর, নবাব বাহাদুর, রায় বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর খিলাতের আশায় বসিয়া আছেন। বঙ্গাধিপ বক্তৃতা করিলেন, উপাধিধারীদিগকে সুখ্যাতি করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। লোকের দৃষ্টি সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে একজনের উপর পড়িল। তিনি আর কেহ নহেন —রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর। অত রাজা, মহারাজা, নবাব থাকিতে, একজন রায় বাহাদুরের প্রতি যে সকলের নজর পড়িল, তাহার যথেষ্ট কারণ আছে। রাজপ্রসাদে মানুষ

ধন্য হয় না—নিজগুণে ধন্য হয়, একথা আমরাও—উপাধি-লোভী জাতি জানি। যদি কখন আমাদের জাতীয় গৌরব হয়, যদি কখন আমাদের সাহিত্য-ভাণ্ডারে অপর জাতিকে প্রদর্শন করিবার উপযুক্ত রত্ন সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃভূমিকে লোকে স্বর্ণগর্ভা বলিবে। ততদিনে রাজা, মহারাজা, নবাবের দল কে কোথায় বিস্মৃতির গর্ভে তলাইয়া ডুবিয়া যাইবে, কে বলিতে পারে? এই কথা বুঝিতে পারিয়া সকলে বলিয়াছিল যে, 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়া বঙ্কিম বাবুর প্রতি অবমাননা প্রকাশ করা হইল।"

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে উপাধির প্রার্থী হওয়া দূরে থাকুক, গেজেটে উপাধির তালিকা মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে তিনি এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারেন নাই।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষ উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সি. আই. ই. উপাধি পাইলেন। যে দিন উপাধিদানের দরবার অনুষ্ঠিত হয়, সেই দিন বঙ্কিমচন্দ্র সেই দরবারে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তখন তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত।

সি. আই. ই. উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁহার বন্ধুবান্ধব অনেকেই অভিনন্দন-পত্র লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্রখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখিয়াছিলেন,—"আপনাকে সম্মানিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে সম্মানিত করিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছিলেন—"আমি জানি, যে কথা আপনি বিশ্বাস করেন না, বা সত্য বলিয়া মনে করেন না,

সে কথা আপনি বলেন না, বা লিখেন না। আমি চিরদিন আপনার পত্রখানি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিব।”

নয়

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের নূতন যুগ আরম্ভ হইল। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত-বহুল বাংলাভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের হস্তস্পর্শে নূতন রূপ ধারণ করিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী নহে, তাঁহার ভাষায় আড়ম্বর বা জটিলতা নাই। দৌর্ব্বোধ্য ঘুচাইয়া ভাষাকে তিনি সরল করিলেন, বড় বড় সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করিয়া তিনি তাহাকে সহজ করিলেন, নীরসকে মধুর করিলেন; প্রকৃতির অনন্ত ভাণ্ডার হইতে ভাব-সম্পদ সংগ্রহ করিয়া তিনি তাহাকে মনোমত করিয়া সাজাইলেন। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি, ভাষা সংস্কার। তিনি কালিদাসের উপমা আনিয়া মাতৃভাষার গলায় দোলাইয়া দিলেন। শ্রীহর্ষের ভাববৈচিত্র্য আনিয়া শিরোভূষণ গড়িয়া দিলেন। ভবভূতির কবিত্ব আনিয়া মেখলারূপে কটিতে জড়াইয়া দিলেন। ভারতচন্দ্রের লালিত্য ও সারল্য আনিয়া চরণে নূপুর স্বরূপ বাঁধিয়া দিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নানা আভরণে সাজাইয়া বঙ্গভাষাকে সুশোভিত করিলেন। তাঁহার দ্বারাই বঙ্গভাষা জগতের সমক্ষে গৌরবময়ী গরীয়সীরূপে দাঁড়াইতে সমর্থ হইল। কিন্তু এই ভাষা সংস্কার করিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে বিস্তর উপহাস, বিদ্রূপ ও গ্লানি সহ্য

করিতে হইয়াছিল। বঙ্গভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যেরূপভাবে ঋণী তেমন আর কাহারও নিকট নহে। সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান সর্ব্বোচ্চ।

১২৭৭ সাল হইতে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি ১২৭৮ সালের শেষ ভাগে সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিলেন। ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাস হইতে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইল।

প্রথম বৎসর বঙ্গদর্শন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। পরে ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে বঙ্গদর্শনের অফিস কাঁটালপাড়ায় উঠিয়া যায় এবং তথা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে।

১২৮২ সাল পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র উহার সম্পাদক ছিলেন। ১২৮৪ সাল হইতে সঞ্জীবচন্দ্র উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ১২৯০ সালের মাঘ মাসে বঙ্গদর্শন উঠিয়া যায়।

বঙ্গদর্শন তুলিয়া দেওয়ার সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে লিখিলেন,—

"চারি বৎসর গত হইল বঙ্গদর্শন প্রকাশ আরম্ভ হয়। যখন ইহাতে আমি প্রবৃত্ত হই, তখন আমার কতকগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পত্র-সূচনায় কতকগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলাম, কতকগুলি অব্যক্ত ছিল। যাহা ব্যক্ত হইয়াছিল, এবং যাহা অব্যক্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অধিকাংশই সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে আর বঙ্গদর্শন রাখিবার প্রয়োজন নাই।

এই সংবাদে কেহ সন্তুষ্ট কেহ ক্ষুব্ধ হইতে পারেন। যদি

কেহ বঙ্গদর্শনের এমত বন্ধু থাকেন যে, বঙ্গদর্শনের লোপ তাঁহার কষ্টদায়ক হইবে, তাঁহার প্রতি আমার এই নিবেদন যে, যখন আমি বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন আমি এমন সঙ্কল্প করি নাই যে, যতদিন বাঁচিব, আমি এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব।

বঙ্গদর্শনের লোপ দেখিয়া যাঁহারা আনন্দিত হইবেন, তাঁহাদিগকে একটি মন্দ সংবাদ শুনাইতে বাধ্য হইলাম। বঙ্গদর্শন আপাততঃ রহিত করিলাম বটে, কিন্তু কখনও যে এই পত্র পুনর্জ্জীবিত হইবে না, এমত অঙ্গীকার করিতেছি না।

চারি বৎসর হইল বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনায় বঙ্গদর্শনকে কালস্রোতে জলবুদ্বুদ বলিয়াছিলাম। আজি সে জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল—

(১) বিষবৃক্ষ—১২৭৯ সালের বৈশাখে আরম্ভ হইয়া ঐ সালের চৈত্র মাসে শেষ হয়।

(২) ইন্দিরা—১২৭৯ সালের চৈত্র।

(৩) যুগলাঙ্গুরীয়—১২৮০ সালের বৈশাখ।

(৪) চন্দ্রশেখর—১২৮০ সালের আশ্বিনে আরম্ভ হইয়া ১২৮১ সালের ভাদ্র মাসে শেষ হয়।

(৫) কমলাকান্ত—১২৮০ সালের ভাদ্র মাসে আরম্ভ হইয়া ১২৮২ সালের বৈশাখে শেষ হয়।

(৬) রজনী—১২৮১ সালের আশ্বিনে আরম্ভ হইয়া ১২৮২ সালের অগ্রহায়ণে শেষ হয়।

(৭) রাধারাণী—১২৮২ সালের কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

(৮) কৃষ্ণকান্তের উইল—১২৮২ সালের পৌষে আরম্ভ হইয়া ১২৮৪ সালের মাঘে শেষ হয়।

(৯) কমলাকান্তের পত্র—১২৮৪ সালের পৌষ, ফাল্গুন এবং ১২৮৫ সালের শ্রাবণ।

(১০) রাজসিংহ—১২৮৪ সালের চৈত্রে আরম্ভ হয়।

(১১) মুচিরামগুড়ের জীবন-চরিত—১২৮৮ সালের আশ্বিন।

(১২) আনন্দমঠ—১২৮৭ সালের চৈত্রে আরম্ভ হইয়া ১২৮৮ সালে শেষ হয়।

(১৩) দেবী চৌধুরাণী—১২৮৯ সালের পৌষ মাসে আরম্ভ হইয়া ১২৯০ সালের মাঘ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, ইহা বঙ্গদর্শনে শেষ হয় নাই।

১২৭৯ সালের বৈশাখে বঙ্গদর্শনের গ্রাহক প্রায় এক হাজার হইয়াছিল। শ্রাবণে বাড়িয়া প্রায় দেড় হাজার হয়। ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণে ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া প্রায় দুই হাজার গ্রাহক হয়। ১২৮২ সালের মাঘ মাসে গ্রাহক সংখ্যা কমিয়া কিঞ্চিদধিক ষোলশত হয়।

বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার দুইটি কারণ দেখা যায়; একটি আত্মীয়-বিরোধ; দ্বিতীয়টি প্রবন্ধ-লেখকদের দক্ষিণার দাবী। যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রবন্ধের মূল্য স্বরূপ অর্থ প্রার্থনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ কিনিতে অসম্মত হইয়া কাগজ তুলিয়া দিলেন।

দশ

বঙ্কিমচন্দ্রকে বুঝিতে হইলে তাঁহাকে সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা—

(১) সমাজ সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্র।

(২) কবি বঙ্কিমচন্দ্র।

(৩) ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র।

(৪) ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্র।

(৫) স্বদেশভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র।

(৬) সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র।

(৭) ধর্ম্মোপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র।

সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উদ্যম—বিষবৃক্ষ; দ্বিতীয় উদ্যম—সাম্য ও লোকরহস্য; তৃতীয় উদ্যম—দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশ ও কমলাকান্তের কয়েকটি প্রবন্ধ।

সমাজ সংস্কারক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র যে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই, একথা বলা যাইতে পারে। বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, বহুবিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, এই সকল বিষয়েই তিনি কিছু না কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি সমাজকে বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সমাজের জন্য কখনও অশ্রু বিসর্জ্জন করেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশভক্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি বাঙ্গালী মাত্রকেই ভালবাসিতেন। তাঁহার রচিত আনন্দমঠ এই স্বদেশ-ভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন।

বাংলার লতাপাতাটি পর্য্যন্ত বঙ্কিমের প্রিয় ছিল। সেই

লতাপাতা দিয়া সাজাইয়া তিনি তাঁহার উপাস্য দেবীর রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিতদ্রুমদল শোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

কমলাকান্তেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশভক্তি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কমলাকান্ত বলিতেছে,—"দেখিলাম, অকস্মাৎ কালের স্রোত দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবল বেগে ছুটিতেছে—অনন্ত অকূল অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, ফিরিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা!' করিয়া ডাকিতেছি! আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই মা আমার? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণকুহর পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণের উদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল,—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা এই সপ্তমীর শারদীয় প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হ্যাঁ, এই মা।

চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকা-রূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা. এক্ষণে কাল গর্ভে নিহিতা রত্নমণ্ডিত দশভুজ দশদিক্—দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রু-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্ভুজা, নানা প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ-বিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞান-মূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

"বঙ্গদেশের কৃষক", "বাঙ্গালীর উৎপত্তি", "ভারতকলঙ্ক" প্রভৃতি অত্যুপাদেয় প্রবন্ধ সমূহ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিতেছে। তিনি বলিতেন, যাহার স্বদেশপ্রীতি নাই, তাহার ধর্ম্ম নাই,—মনুষ্যত্ব নাই—সে সকলের ঘৃণ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র একজন তীব্র সমালোচক ছিলেন। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় সমালোচক বাংলায় জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি কখনও কাহারও খাতির রাখিয়া কথা বলিতেন না। এইজন্য সময় সময় তাঁহাকে গালি খাইতে হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পর সমালোচকের আসন শূন্য হইয়াছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"বঙ্কিম যে দিন সমালোচকের আসন হইতে অবতীর্ণ

হইলেন, সেদিন হইতে এ পর্য্যন্ত আর সে আসন পুর্ণ হইল না। এখনকার অরাজকতার চিত্র মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, সাহিত্য-সিংহাসনে কে আমাদের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার অভাবে শাসনভার গ্রহণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি কেহই উপস্থিত নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপর একদল লোকের সুতীব্র বিদ্বেষ ছিল, এবং ক্ষুদ্র যে লেখক-সম্প্রদায় তাঁহার অনুকরণের বৃথা চেষ্টা করিত, তাহারাই আপন ঋণ গোপন করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গালি দিত।

মনে আছে, বঙ্গদর্শনে যখন তিনি সমালোচক-পদে আসীন ছিলেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র শত্রুর সংখ্যা অল্প ছিল না। শত শত অযোগ্য লোক তাঁহাকে ঈর্ষা করিত। এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িত না।

ছোট ছোট দংশনগুলি যে বঙ্কিমচন্দ্রকে লাগিত না তাহা নহে, কিন্তু কিছুতেই তিনি কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহার অজেয় বল, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং নিজের প্রতি বিশ্বাস ছিল।”

একবার একখানি নাটক বঙ্গদর্শনে সমালোচনার্থ প্রেরিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে এই নাটকখানির কিছু তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। যিনি নাটক লিখিয়াছিলেন, তাঁহার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পুস্তকখানি অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা তাঁহার প্রীতিকর হইল না। বঙ্কিমচন্দ্রকে গালি দিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার

এক আত্মীয়ের শরণাগত হইলেন। এই আত্মীয়ের একখানি কাগজ ছিল। কাগজের নাম—'বসন্তক'। তাহাতে ভাল ভাল ছবি থাকিত। বিলাতের 'পঞ্চ' কাগজ লোককে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া ছবি দেয়, বসন্তকও সেই প্রকার ছবি দিয়া লোককে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। বসন্তক-সম্পাদক আত্মীয়টির অনুরোধে বসন্তকে এক ছবি বাহির করিলেন। সাহিত্যক্ষেত্র নাম দিয়া তিনি একটি ক্ষেত্র আঁকিলেন। সেই ক্ষেত্রে একটি প্রকাণ্ডকায় ষাঁড় এবং কয়েকটি ভেক অঙ্কিত হইল। ষাঁড়ের পার্শ্বে লেখা হইল,—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। আর একটি ক্ষুদ্র ভেকের বক্ষের উপর লিখিত হইল,—'বঙ্গদর্শন।' এইরূপে সমালোচক-শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্রকে কর্ত্তব্যানুরোধে গালি খাইতে হইয়াছিল।

"কৃষ্ণচরিত্র" বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অক্ষয় কীর্ত্তি। যিনি দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষের ন্যায় উপন্যাস লিখিয়াছেন, তাঁহারই লেখনী হইতে "কৃষ্ণচরিত্র" নির্গত হইল, ইহা ভাবিয়া লোকের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এই পুস্তক লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যেমন প্রশংসা লাভ করিলেন, তদ্রূপ আবার তাঁহাকে কিছু কিছু গালি খাইতেও হইয়াছিল। গালি খাইতে হইয়াছিল দুই শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে। প্রথম একদল বলিলেন, "আমাদের পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ নাস্তিক বঙ্কিমবাবুর হাতে পড়িয়া তোমার আমার মত মানুষ হইল।" আর একদল বলিলেন, "শঠ, বঞ্চক, পারদারিক কৃষ্ণকে বঙ্কিমবাবু আদর্শ পুরুষ বলিলেন কি প্রকারে ?" দুই দলই বঙ্কিমচন্দ্রের উপর বীতরাগ হইলেন।

"ধর্ম্মতত্ত্ব" বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় কীর্ত্তি। তৃতীয় কীর্ত্তি—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা। কিন্তু তিনি টীকা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। চতুর্থ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণ হইলে আজ তাহা বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

এগার

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম জাপানী ভাষায় উপন্যাস রচিত হয়। মুরাসাকী নাম্নী এক জাপানী মহিলা "গেঞ্জী মনোগাটারী" নামক উপন্যাস ১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। ইহাই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে উপন্যাস ছিল বলিয়া শুনা যায়না। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের তুলাল'ই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম উপন্যাস। কিন্তু এই পুস্তকখানি এখন বিস্মৃতপ্রায়।

বঙ্কিমচন্দ্রকেই প্রকৃত পক্ষে বাংলার প্রথম ঔপন্যাসিক বলা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র-অঙ্কিত নরনারীর চরিত্রগুলি যে সজীব তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ আদর্শ নরচরিত্র গড়িয়াছেন, এরূপ আদর্শ নরচরিত্র ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকেরা বড় বেশী গড়িতে পারেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র একটা বিষয়ে অনেক ইউরোপীয় উপন্যাসকারের অপেক্ষা উচ্চে অধিষ্ঠিত। তিনি মনুষ্য চরিত্র যেরূপ তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে দেখিতেন, যেরূপ অল্প কথায় তাহা অঙ্কিত করিতেন, সেরূপ বড় বেশী কেহ পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র বিনা আড়ম্বরে, অল্প কথায়, সামান্য ঘটনার সাহায্য লইয়া বড় বড় চরিত্র পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমের কোনও উপন্যাস পড়িতে কখনও কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছে, এরূপ শুনা যায় না। তাঁহার কোনও উপন্যাসে এমন অংশ নাই, যাহা পরিত্যাজ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, এই সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অধিকাংশ পাশ্চাত্য উপন্যাস হইতে শ্রেষ্ঠ।

কবিত্ব উপন্যাসের প্রধান অঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যে কবিত্ব আছে, বর্ত্তমান কালে ইংলণ্ডের কোনও উপন্যাসে তাহা নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার উপন্যাস-জগতে তথা সাহিত্য-জগতে একা যাহা করিয়াছেন, সত্য সত্যই তাহা পরম বিস্ময়ের বস্তু। পৃথিবীর অন্য কোনও ব্যক্তি তাহা করিতে সমর্থ হন নাই। বঙ্কিম চন্দ্র ভাষা গড়িলেন, উপন্যাস গড়িলেন ; ইহা গড়িতে তাঁহার পঁচিশ বৎসরও লাগে নাই। ইংলণ্ডে পঁচিশ বৎসরে ইংরেজী উপন্যাস গঠিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে কার্য্য একজনের দ্বারা সাধিত হয় নাই, বহুজনের সম্মিলিত চেষ্টায় হইয়াছিল।

বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগে অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত ও বাংলা-বিদ্বেষী ছিল। এত অসুবিধার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র একা যাহা করিয়াছিলেন, ইউরোপের কোনও ঔপন্যাসিক তাহা করিতে পারেন নাই। বাংলায় অল্প সময়ের মধ্যে ভাষা ও

উপন্যাস যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে সেইরূপ উন্নতি সেই সময়ের মধ্যে হয় নাই। সেইজন্যই বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট যতটা ঋণী, পৃথিবীর কোনও জাতি কোনও উপন্যাসকারের নিকট ততটা ঋণী নহে।

বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিবার একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি খাতা বাঁধিয়া পুস্তকের আখ্যানাংশ স্থির করিয়া লইয়া লিখিতে বসিতেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদ পূর্ব্বেই নির্দিষ্ট করিয়া লইতেন। প্রত্যেক পরিচ্ছেদে কোন্ কোন্ ঘটনার সমাবেশ হইবে,—কোন্ কোন্ নরনারী অবতীর্ণ হইবে, তাহাও একপ্রকার নিরূপিত হইত। অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম পুনঃ পুনঃ ঘটিত। এমন কি, সময় সময় দুই এক পরিচ্ছেদ পরিত্যক্ত হইত, দুই এক পরিচ্ছেদ পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন আকার ধারণ করিত।

বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ত তাঁহার লেখার পরিবর্ত্তন করিতেন। সে পরিবর্ত্তন লিখিবার সময় হইত, পরদিন হইত, ছয় মাস এক বৎসর পরেও হইত। যতক্ষণ না কথাটি তাঁহার মনঃপূত হইত, ততক্ষণ তিনি পরিবর্ত্তন করিতেন।

যতদিন তিনি গভর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহার লিখিবার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। তিনি প্রায়ই রাত্রি ৮টার পর লিখিতে বসিতেন, রাত্রি ২৷৷০টা পর্য্যন্ত লিখিতেন।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সকল সময়ে একটু একটু করিয়া লিখিতেন। রাত্রি জাগিয়া লিখিবার অভ্যাস ক্রমে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাতে, অপরাহ্ণে সন্ধ্যায় যখনই সময় পাইতেন, তখনই কিছু কিছু লিখিতেন।

লিখিবার সময় তাঁহাকে কখন গম্ভীর, কখন বা তরলমতি বালকের ন্যায় দেখাইত। কখন হয়ত এক ছত্র লিখিয়া তখনই তাহা কাটিয়া দিতেন। পরমুহূর্ত্তেই হয়ত লেখনী পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া কিয়ৎকাল গৃহমধ্যে হাঁটিয়া বেড়াইতেন, কখনও বা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দূর সৌধচূড়ার দিকে অপলক নেত্রে বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইয়া চাহিয়া থাকিতেন। এমন অনেক দিন গিয়াছে যেদিন বহু চেষ্টা করিয়াও এক ছত্র লেখা হইত না। আবার এমন অনেক দিন গিয়াছে, যেদিন তাঁহার লেখনী অবিশ্রাম গতিতে চলিয়াছে,—তাহার বিরাম নাই।

বার

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের মধ্যে "কৃষ্ণকান্তের উইলের" স্থান সর্ব্বোচ্চে। কাব্যাংশে "কপালকুণ্ডলা" শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। "বিষবৃক্ষ", "চন্দ্রশেখর", "রাজসিংহ" প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস। "মৃণালিনীর" স্থান সর্ব্বনিম্নে।

প্রথম তিনখানি পুস্তক (দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী) সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"প্রথম তিনখানি বইএর জন্য আমি ইংরেজী সাহিত্যের নিকট ঋণী, তবে দুর্গেশ-নন্দিনী লেখার পূর্ব্বে আমি "আইভানহো" পড়ি নাই। কপালকুণ্ডলা লেখার সময় শেক্সপীয়ার বেশী পড়িতাম। মৃণালিনীর পর কেবল ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি পড়িতাম।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সমূহের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি তাঁহার

কোনও উপন্যাসেই নায়কের পদে দরিদ্রকে স্থান দান করেন নাই। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, সীতারাম, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ প্রভৃতিতে রাজা বাদশাহের কথা,—বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী, দেবী চৌধুরাণী গ্রন্থ ধনবান্ জমিদারদিগকে লইয়া। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা দরিদ্র হইলেও তাঁহারা রাজার ভাণ্ডার লুটিতেছেন, রাজাকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যাভিলাষী হইয়াছেন। তাই আমরা দেখিতে পাই, বঙ্কিমোপন্যাসে দরিদ্রের স্থান নাই।

"দুর্গেশনন্দিনী" বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। ইহা তিনি তাঁহার চব্বিশ বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ লেখা শেষ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন খুলনায়। পুস্তকখানি শেষ করিয়া উহা প্রকাশের যোগ্য কিনা তাহা জানিবার জন্য পাণ্ডুলিপিখানি তাঁহার অগ্রজ শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে আদ্যন্ত পড়িয়া শুনাইলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র বড়ই দমিয়া গেলেন। তিনি ভগ্নহৃদয়ে দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন।

কয়েকমাস কাটিয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র এই কয়মাস কিছুই লিখিলেন না। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজদ্বয়ের ভুল ভাঙ্গিল। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মস্থলে যাইয়া দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাহা ছাপিতে দিলেন।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের যশ হইল না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাহাতে দমিলেন না।

তিনি "কপালকুণ্ডলা" লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এইবার গ্রন্থ শেষ করিয়া তাহা তিনি কাহাকেও পড়িয়া শুনাইলেন না। তখন তাঁর আত্মশক্তিতে বিশাস জন্মিয়াছিল, এই বিশ্বাস তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র শুধু একজনকে তাঁহার পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইতেন, তিনি তাঁহার স্ত্রী। যখনই যতটুকু লেখা হইত তাহা তিনি তাঁহার স্ত্রীকে পড়িয়া শুনাইতেন।

দুর্গেশনন্দিনী নবযুগের প্রথম উপন্যাস। যখন উহা প্রথম প্রকাশিত হয় তখন বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে নব আগন্তুক। তখন তাঁহার কোনও প্রতিষ্ঠা ছিল না। তখনকার একখানি সাময়িক পত্রে দুর্গেশনন্দিনীর যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত দুর্গেশনন্দিনী পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। ইহার কল্পনা, গ্রন্থন, রচনা সকলই নূতন প্রকারে নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং তাহাতে কাহাকেও চর্ব্বিত চর্ব্বণের ক্লেশ পাইতে হয় না। যাঁহারা ইংরেজী গদ্যকাব্য পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের মনে দুর্গেশনন্দিনীর অনেক স্থানে ইংরেজী নভেলের প্রতিভা লক্ষ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতিভার কোন বিশেষ হানি হয় নাই। যাঁহারা নূতন সরস মনোমুগ্ধকর গল্পের অনুরাগী ; যাঁহারা বীর্য্যবৎ বাক্যের আদরকারী যাঁহারা বিনা অনুপ্রাসে রচনার চাতুর্য্য হইতে পারে এমত জ্ঞান করেন ; যাঁহারা মহৎগুণে পরিতৃপ্ত হন ; তাঁহারা দুর্গেশনন্দিনীতে আপন

আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন; কারণ ইহা তাঁহাদের সকল অভীষ্টের সম্যক প্রকারে পোষক সন্দেহ নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র নাগোয়াতে (বর্ত্তমান কাঁথি) অবস্থানকালে একদিন একজন কাপালিকের দর্শন পাইয়াছিলেন। তখন অনেক রাত্রি। বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁহার ভৃত্যেরা সকলেই নিদ্রিত। এমন সময় বাটীর দ্বারে সবলে করাঘাত হইতে লাগিল। এই করাঘাতে ভৃত্যেরা জাগিয়া উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল, সম্মুখে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া। ভৃত্যেরা জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান?" সন্ন্যাসী উত্তর করিল, "বাবুকে ডাক।" ভৃত্যেরা বঙ্কিমচন্দ্রকে ডাকিয়া দিল। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারে আসিয়া দেখিলেন, একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী নরকপাল হস্তে দণ্ডায়মান। তাহার আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা-পরিশোভিত, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ললাটে অঙ্গার রেখা, সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম। বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিলেন, এ ব্যক্তি কাপালিক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ডাকিতেছ কেন?"

কাপালিক কহিল—"আমার সঙ্গে আইস।"

বঙ্কিম। কোথায়?

কাপালিক। সমুদ্রতীরে—বালিয়াড়িতে।

বঙ্কিম। আমি যাইব না।

কাপালিক দ্বিরুক্তি না করিয়া প্রস্থান করিল। পরদিন রাত্রিতে ঠিক সেই সময়ে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ করিল। এবারও সে বঙ্কিমচন্দ্রকে তাহার সঙ্গে আসিতে বলিল এবং পূর্ব্বানুরূপ উত্তর পাইয়া প্রস্থান করিল। তৃতীয় দিবসেও

আসিয়াছিল। এইরূপে উপর্য্যুপরি তিন দিবস প্রত্যাখ্যাত হইয়া কাপালিক আর আসে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র একদিন যাইয়া সেই বালিয়াড়ি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তাহার বর্ণনা কপালকুণ্ডলায় আছে। এই কাপালিক-দর্শনই কপালকুণ্ডলার ভিত্তি বলিয়া মনে হয়।

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস। কপালকুণ্ডলা বিয়োগান্তক উপন্যাস।

"বিষবৃক্ষ" বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ উপন্যাস। ইহা প্রথম বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, পরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

একবার বাবু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"শুনিয়াছি, বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, কথাটা কি সত্য?"

বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিয়াছিলেন,—"কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপর অনেক রং ফলাইয়াছি।"

কবি কালিদাস "মেঘদূত" লিখিয়া সংস্কৃত-সাহিত্যে যাহা দান করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র "বিষবৃক্ষ" লিখিয়া সদ্য-গঠিত বঙ্গ সাহিত্যকে তাহার অধিক ধনরত্ন প্রদান করিলেন।

ইংরাজীতে যাহাকে প্লট বলে বিষবৃক্ষে তাহা নাই। বিষবৃক্ষে কোনও আড়ম্বর নাই,—অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ নাই। তাহাতে কোনও অসাধারণত্ব দৃষ্ট হয় না। সংসারে সচরাচর যাহা ঘটে তাহা লইয়াই বিষবৃক্ষ।

গ্রন্থের তিনটি চরিত্র প্রধান,—কুন্দনন্দিনী, সূর্য্যমুখী ও নগেন্দ্রনাথ। কুন্দনন্দিনীর চরিত্র অঙ্কন করিতে বঙ্কিমচন্দ্র যতটা

কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, এতটা কৌশল আর কোনও চরিত্র অঙ্কনে করেন নাই।

ইহার পর "আনন্দমঠের" কথা বলিব। "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতের জন্য ইহা বঙ্গসাহিত্য-জগতে এক অমূল্য সম্পদ্ বলিয়া পরিগণিত। আনন্দমঠ স্বদেশ-প্রেমে উচ্ছ্বসিত, কিন্তু ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব বড় বেশী নাই। তথাপি আনন্দমঠে যাহা আছে, বাংলা কোনও গ্রন্থে তাহা নাই।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোনও উপন্যাস রচনার ইচ্ছা বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক দিন হইতেই ছিল। কিন্তু যৌবনে তাহা তিনি লিখেন নাই, পরিণত বয়সে আনন্দমঠে তাহা প্রলিফলিত করিলেন। "বন্দেমাতরম্" গানটি ইহার বহু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

একজন সমালোচক আনন্দমঠের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন,—"বঙ্কিম, তুমি মাতার সুসন্তান; তুমি বঙ্গের নরকান্ধকারে শাপভ্রষ্ট দেবতা। কেননা, তুমি যে উদ্দেশ্য বুকে ধরিয়া, যে আগুন লেখনীতে মাখিয়া আনন্দমঠ লিখিতে বসিয়াছিলে, তাহা সপ্তম স্বর্গের মহামৃত অপেক্ষাও পবিত্র এবং দুর্ল্লভ। আজ বঙ্গের সপ্তকোটি হৃদয়-তন্ত্রীর তারস্বর তোমার স্বরে মিলিত, সপ্তকোটী প্রাণ তোমার জ্বলন্ত প্রাণে অনুপ্রাণিত। আজ দ্বিসপ্তকোটী সজল চক্ষু স্বর্গের দিকে রাখিয়া দ্বিসপ্তকোটী হস্ত তুলিয়া সমস্ত বঙ্গের নরনারী তোমাকে নীরব গম্ভীরে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। তুমিই ধন্য এবং কৃতার্থ।"

"বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার জ্যেষ্ঠা

কন্যাকে বলিয়াছিলেন,—"একদিন দেখিবে,—বিশ ত্রিশ বৎসর পরে একদিন দেখিবে, এই গান লইয়া বাংলা উন্মত্ত হইয়াছে,—বাঙ্গালী মাতিয়াছে।"

একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে অনেকগুলি সাহিত্যসেবীর সমাগম হইয়াছিল। সেই সাহিত্য-বাসরে কবিবর নবীনচন্দ্র সেন কথায় কথায় আনন্দমঠের বিখ্যাত 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতটির একাংশ আবৃত্তি করিয়া বঙ্কিমবাবুকে বলিলেন,—"এমন ভাল জিনিসটিকে আধ-সংস্কৃত আধ-বাংলায় লিখিয়া মাটি করা হইয়াছে। এ যেন গোবিন্দ অধিকারীর গানের মত। লোকের ভাল লাগে না।"

এই কথায় বঙ্কিমচন্দ্র ঈষৎ কুপিত স্বরে বলিলেন,—"আচ্ছা, ভাই, ভাল না লাগে পড়িও না। আমার ভাল লাগিয়াছে তাই ওরকম লিখিয়াছি। লোকের ভাল লাগে কিনা, তাহা ভাবিয়া আমি লিখিব!"

"বন্দেমাতরম্" শব্দের অর্থ লইয়া ইংলণ্ডে অনেক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। নানা জনে নানা অর্থ করিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালী বেশ জানে, "বন্দেমাতরম্" গানের অর্থ কি? বাঙ্গালী জানে, গানের ভিতর বিদ্রোহবহ্নির ধূম নাই—সংহারকর্ত্রী কালীরও আহ্বান নাই, গানটি জন্মভূমির স্তোত্র মাত্র। জন্মভূমিকে জননীরূপে—আরাধ্যা দেবীরূপে—সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সর্ব্বক্ষমতাময়ী প্রকৃতিরূপে কল্পনা করিয়া কবি তাঁহার আহ্বান গাহিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র স্থির বুঝিয়াছিলেন, এই "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত একদিন না একদিন বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ভক্তিপূর্ব্বক ধ্বনিত

হইয়া বাঙ্গালায় নব জীবন আনয়ন করিবে,—নূতন শক্তি সঞ্চার করিবে। আজ বঙ্কিমচন্দ্রের সে আশা সফল হইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়াস্থ বাসভবনে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হইত। বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮২ সালে রথযাত্রার সময় ছুটি লইয়া গৃহে আসিয়াছিলেন। রথে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। সেই ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারাইয়া যায়। এই ঘটনার দুই মাস পরে "রাধারাণী" লিখিত হয়। বোধ হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া "রাধারাণী" রচনা করিয়াছিলেন।

"রাজসিংহ" বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে হইতে বন্ধ হইয়া যায়। বাবু চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এক দিন বঙ্কিমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আপনার 'রাজসিংহ' প্রকাশিত হইতেছে না কেন?"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন, "কেহ কেহ বলেন, আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপিলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।"

চন্দ্রশেখরবাবু বলিলেন,—"মাণিকলালের মত দুই একটি ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ছাড়া অপকার হইবে না!"

এই কথায় "রাজসিংহ" শেষ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তমলুকের ঘটনা লইয়া "যুগলাঙ্গুরীয়" রচিত হয়। যুগলাঙ্গুরীয় রচিত হইবার প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে একবার

বঙ্কিমচন্দ্র তমলুকে গিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তমলুকের পদ প্রক্ষালন করিয়া সমুদ্র প্রবাহিত হইত, এখন সমুদ্র অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে। রূপনারায়ণ নদ তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যখন তমলুকে গিয়াছিলেন, তখন তাহার পূর্ব্ব-বাণিজ্য-গৌরব লোপ পাইয়াছে, সে-শ্রী চলিয়া গিয়াছে, কেবল স্মৃতিটুকু তখনো যায় নাই।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তমলুকে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তখন তমলুক তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সে বিশাল-হৃদয় রূপনারায়ণ দেখিলেন, "মৃদু পবনোত্থিত তরঙ্গে বালারুণ রশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে।"—এই দৃশ্য,—তমলুকের এই দৃশ্য—বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। পনর বৎসরেও তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই। পনর বৎসর পরে তিনি তমলুকের এই চিত্র "যুগলাঙ্গুরীয়ে" অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

"চন্দ্রশেখর" প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। ১২৮১ সালের ভাদ্রমাসে চন্দ্রশেখর উক্ত পত্রিকায় সম্পূর্ণ হয়। তাহার পর ১২৮২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে চন্দ্রশেখর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

"কৃষ্ণকান্তের উইল" প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইতে থাকে। ১২৮২ সালে ইহার প্রথম নয় পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়। পরে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন তুলিয়া দেন। ১২৮৪ সালে

বঙ্গদর্শন পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বেকার অসমাপ্ত কৃষ্ণকান্তের উইল ১২৮৪ সালের বঙ্গদর্শনের দশম পরিচ্ছেদ হইতে প্রকাশিত হইয়া সমাপ্ত হয়। ১২৮৫ সালে কৃষ্ণকান্তের উইল গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

"ইন্দিরা" ১২৮০ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন তাহার কলেবর অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল। এই পুস্তকখানির তখনকার দাম ছিল চারি আনা। পঞ্চম সংস্করণে এই গ্রন্থখানি বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হয়। পনরটি নূতন পরিচ্ছেদ ইহাতে সংযোজিত হয় এবং দাম হয় দেড় টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে "কৃষ্ণচরিত্র" লেখেন। কিন্তু এই পুস্তক লিখিয়া তিনি খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। কেহ তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কেহ শ্রীকৃষ্ণকে আদর্শপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইহাতে ব্যথিত হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই শিক্ষা হইল যে, নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত বাঙ্গালা দেশে কোনও দেবতা বিশেষের উপাসনা প্রচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যে দেশে শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম, নাস্তিক প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রতি নিয়ত পরস্পর লড়াই করিতেছে, সে দেশে কোনও এক দেবতাকে সকলে গ্রহণ করিতে পারে না। এই শিক্ষা পাইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র "অনুশীলন-তত্ত্বে" মনোনিবেশ করিলেন। এই তত্ত্ব খৃষ্ট'ন, মুসলমান, ব্রাহ্ম কেহই উপেক্ষা করিতে পারে

না। এই "অনুশীলন-তত্ত্বে" গীতা ও ভাগবত, বেদ ও দর্শন, যোগ ও কর্ম্ম, মায়া ও জ্ঞান সকলই স্থান পাইয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্র "নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী" নামক একটি ভূতের গল্প লিখিতে আরম্ভ করেন। কতকটা লিখিয়াই তিনি মৃত্যুশয্যা গ্রহণ করেন, তাই তিনি আর উহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সাহিত্য-পত্রিকার জন্যই এই গল্পটি লিখিত হইতেছিল।

তের

বঙ্কিমচন্দ্র খেলাধূলায় বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না,—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শৈশব হইতেই পুস্তকপাঠে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। শৈশবে রামায়ণ, মহাভারত, বেহুলার উপাখ্যান, মনসার ভাসান প্রভৃতি পড়িয়াছিলেন। তাঁহার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন তিনি দুই একখানা সংস্কৃত কাব্য পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার কবিতা লিখিবার খেয়াল হইল। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদিত "প্রভাকর" পত্রিকা নিয়মিত পড়িতেন ও তাহাতে লিখিতেন। ক্রমে যত বয়স হইতে লাগিল এবং ইংরেজী শিখিতে লাগিলেন, ততই ইংরেজী কাব্যের অনুরাগী হইয়া পড়িলেন। বহু ইংরেজী নাটক, কাব্য ও সাহিত্য তিনি অধ্যয়ন করিলেন। পঁচিশ বৎসর অতিক্রম করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস ও জীবন-চরিত পাঠে মনোযোগী হইলেন। ত্রিশ বৎসরের পর মৃণালিনী

লিখিবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস ও বিজ্ঞান পাঠ করিতে আরম্ভ করেন।

এই সময় তাঁহার গান শিখিবার ইচ্ছা হয়। কাঁটাল-পাড়ায় একজন বিখ্যাত গায়ক বাস করিতেন। তাঁহার নাম যদুভট্ট তান্‌রাজ। বঙ্কিমচন্দ্র গান শিখিবার জন্য তাঁহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন। এই যদু-ভট্টের নিকট তিনি গান শিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার তানলয়-বোধ অনন্যসাধারণ ছিল। হারমোনিয়ম বাজাইতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

চিকিৎসা-শাস্ত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র ব্যুৎপন্ন ছিলেন। আলিপুরে চাকরি করিবার সময় তিনি কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে শরীরতত্ত্ব পড়িয়াছিলেন। তিনি শরীরতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন হইয়া গৃহে বসিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া, বহু চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ তিনি কিনিয়া ফেলিলেন।

কলিকাতায় বাস-কালে মধ্যবয়সে বঙ্কিমচন্দ্র একটু জ্যোতিষ-বিদ্যাও আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষী ক্ষেত্রমোহন ছিলেন এই বিষয়ে তাঁহার শিক্ষা-গুরু। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যোতিষশাস্ত্র বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু হস্তাঙ্ক গণনায় তাঁহার তেমন বিশ্বাস ছিল না।

একবার তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষীর নিকট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষী মহাশয় সেবার মুখাবয়ব দর্শন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির

গণনা করিয়াছিলেন, সেই গণনায় বঙ্কিমচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া জ্যোতিষীকে লিখিয়াছিলেন,—"আপনার গণনা-কার্য্যে কৃতকার্য্যতার জন্য আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, ইহা আমাকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। শেষ বয়সেও তাঁহার এই আগ্রহ তিরোহিত হয় নাই। একবার তিনি বেদ ও উপনিষদ্ শিক্ষা করিবার জন্য আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আচার্য্য মহাশয়ের পূর্ব্বে আলাপ ছিল না, পরে উভয়ের মধ্যে কুটুম্বিতা সংস্থাপিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র সৌখীন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার আশে পাশে সমস্তই বেশ পরিপাটী, পরিচ্ছন্ন, সাজান-গোছান থাকিত। বঙ্কিমবাবুর পোষাক-পরিচ্ছদে বিলাসিতা বা বাবুগিরি ছিল না, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা ও পারিপাট্য ছিল। বাড়ীতেও বঙ্কিমচন্দ্রের বুকের বোতাম দুই-একটাও খোলা থাকিত না। শেষ বয়সে তিনি দাড়ী গোঁফ ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ কামাইতেন। তাঁহার সোনার চশমাখানি সর্ব্বদা তক তক ঝক ঝক করিত। খাপখানিও সেইরূপ। ঘরের আসবাব-পত্র সুবিন্যস্ত ও পরিচ্ছন্ন। টেবিল, দোয়াত, কলম, কাগজপত্র, বই প্রভৃতি যথাস্থানে সুরক্ষিত, কোথায়ও এক বিন্দু ধূলি নাই। তিনি লিখিবার পরই কলমটি মুছিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিতেন। গুড়গুড়িটি মাজা, নলটি ধোয়া-মোছা। চাকর মুরলী বড় কলিকায় 'তাওয়া' দিয়া উৎকৃষ্ট সুগন্ধি মিঠা

তামাক সাজিয়া দিত। বঙ্কিমবাবু বেশ ধীরে ধীরে তামাক টানিতে থাকিতেন। তাঁহার বাড়ীতে ঢুকিলে, ঘরের চারিদিকে তাকাইলে, কোথাও কিছু অসামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হইত না।

সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের সৌখীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সৌন্দর্য্যের কবি। তাঁহার কল্পনায় সৌন্দর্য্য, রচনায় সৌন্দর্য্য, বাক্য-বিন্যাসে সৌন্দর্য্য, শব্দ-চয়নে সৌন্দর্য্য। তাঁহার উপন্যাসের অনেক পাত্রপাত্রীই সৌখীন ও সৌন্দর্য্য-প্রিয়। তাঁহার আদর্শও সৌন্দর্য্য।

বঙ্কিমচন্দ্র সময়ের মূল্য বিশেষ ভাবেই জানিতেন এবং তাহা রক্ষা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। এই সময়ের মূল্য বুঝিতেন বলিয়াই গুরুদায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি বাংলা সাহিত্যে অতগুলি অমূল্য সম্পদ্ দান করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। তবে সাহিত্যিকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করা সময়ের অপব্যয় বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। তাঁহার সান্‌কিভাঙ্গার বাড়ীতে প্রায়ই বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের বৈঠক বসিত। এই বৈঠকে সাহিত্য-চর্চ্চাই বেশী হইত।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গ্রন্থেরই ইংরেজী অনুবাদ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি "দেবীচৌধুরাণীর" ইংরেজীতে অনুবাদের সম্মতি কাহাকেও প্রদান করেন নাই। তিনি নিজে উহার অনুবাদ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা তিনি প্রকাশ করেন নাই। তিনি বলিতেন,—"ইংরেজরা বহু বিবাহ পছন্দ করে না। এই গ্রন্থ ইংরেজীতে অনূদিত হইলে তাহারা বাঙ্গালী জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিবে।"

সাহিত্যিক মাত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রিয় ছিলেন। তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে বা বিপদে সাহায্য করিতে কখনও তিনি পরাঙ্মুখ ছিলেন না। একবার ঔপন্যাসিক অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কিছু বিপদে পড়িয়াছিলেন। "প্রকৃতি" নামে তাঁহার একখানি সাপ্তাহিক পত্র ছিল। অনুকূলবাবু ইহার সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস উক্ত পত্রে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। কবিতাটি ভাওয়ালের রাজা ও কালীপ্রসন্ন ঘোষকে আক্রমণ করিয়া লিখিত হইয়াছিল। কালীপ্রসন্ন বাবু এই কবিতাটি পড়িয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অনুকূল-বাবুর নামে ঢাকা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক মামলা রুজু করিলেন। স্থানীয় যাবতীয় উকীল মোক্তার কালীপ্রসন্ন-বাবুর পক্ষাবলম্বন করিলেন। দরিদ্র সাহিত্যসেবী অনুকূলবাবু মহা বিপদে পড়িলেন। মোকদ্দমা মিটাইয়া লইবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইল, কিন্তু ফল কিছুই হইল না।

অবশেষে অনুকূলবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বে কোনও পরিচয় ছিল না। কিন্তু একজন সাহিত্যিকের বিপদ্ দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ কালীপ্রসন্নবাবুকে লিখিলেন,—"অনুকূল সাহিত্যসেবা করিতে গিয়া আজ বিপদ্গ্রস্ত। তাহার বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছ, তাহা উঠাইয়া লইবে। যদি লও, তাহা হইলে এই অনুগ্রহ আমার প্রতিই করা হইল, জানিবে।"

কালীপ্রসন্নবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের এই অনুরোধ রক্ষা না করিয়া পারিলেন না। অবিলম্বে তিনি মোকদ্দমা উঠাইয়া লইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতায় একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া তথায় জীবনের শেষ কয়েক বৎসর বাস করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই বাড়ীতে উঠিয়া আসেন। বাড়ীটি পটলডাঙ্গায় মেডিক্যাল কলেজের সম্মুখে অবস্থিত। ইহা এক্ষণে 'বঙ্কিম-আশ্রম' নামে পরিচিত। বড়লাট লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে গভর্ণমেণ্ট হইতে একটি প্রস্তর-ফলক এই বাড়ীর প্রাচীর-গাত্রে আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে লেখা আছে,—এই স্থানে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বাস করিতেন। জন্ম—সন ১৮৩৬, মৃত্যু—সন ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ।

শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র বড় একটা ইংরেজীতে পত্র লিখিতেন না। তিনি বলিতেন,—"বাংলা ভাষায় যখন আমরা সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারি, তখন আমরা নিজের ভাষা ছাড়িয়া কেন অপরের ভাষায় পত্র লিখিব? তা ছাড়া ইংরেজী ভাষাটা insincere বলিয়া মনে হয়।"

চৌদ্দ

বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় ছিল অতীব স্নেহপূর্ণ ও প্রেমময়। সেইরূপ স্নেহ ও প্রেম সংসারে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। বঙ্কিমচন্দ্র মাতপিতাকে সাধারণ মানুষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন না;—তাঁহাদিগকে তিনি জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবতা মনে করিতেন। স্ত্রীকে শুধু ভার্য্যা মনে করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না,—সহধর্ম্মিণী জ্ঞানে শ্রদ্ধা করিতেন। কন্যাদিগকে অন্যান্য সাধারণ পিতা অপেক্ষা অধিকতর স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন তাঁহার প্রথম কর্ম্মস্থল যশোহর অভিমুখে যাত্রা করেন, তখন তিনি জননীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পাদোদক একটা শিশিতে ভরিয়া লইয়াছিলেন। যে জলটা জননীর পদস্পৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা ছিল গঙ্গাজল। জননী বলিলেন,—"কর্‌লি কি! গঙ্গাজল আমার পায়ে ঠেকালি!"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন,—"মা, তোমার চেয়ে কি গঙ্গা বড় ?"

এইভাবে তিনি তাঁহার পিতারও পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় ছিল দয়ার উৎসস্বরূপ, কিন্তু সে দয়া যখন তখন অপাত্রে অর্পিত হইত না। যাহাকে উপযুক্ত মনে করিতেন তাঁহার উপর হৃদয় নিঃশেষ করিয়া সে দয়া বর্ষিত হইত। একবারের কথা বলি,—

বঙ্কিমচন্দ্র সে সময়ে নাগোয়ায় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট। এখন আর নাগোয়ায় মহকুমা নাই, কাঁথিতে উঠিয়া গিয়াছে। সে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্যামাচরণবাবু তমলুকের হাকিম। উভয় স্থানের মধ্যে প্রায় বিশ ক্রোশ ব্যবধান। এই পথ অতিক্রম করিতে প্রায় পনর ঘণ্টা সময় লাগে। বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একদিন অতি প্রত্যূষে শিবিকারোহণে তমলুক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একটি নদী ছিল, উহার নাম হল্‌দি। নদীটি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, ইহা সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে। নদীতে একটি খেয়া-ঘাট ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন খেয়াঘাটে আসিয়া 'পৌঁছিলেন, তখন প্রায়

মধ্যাহ্ন। নদীর তীরে খেয়া নৌকাখানা বাঁধা আছে, কিন্তু মাঝি নাই। মাঝির বাড়ী একটু দূরেই ছিল। চাপরাশী মাঝির সন্ধানে ছুটিল। পথেই মাঝির সহিত সাক্ষাৎ হইল। চাপরাশী তাহাকে খুব ধমকাইল এবং হাকিম সাহেব তাহাকে খুব শাস্তি দিবেন এই ভয়ও দেখাইল। মাঝি ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইল। বঙ্কিমচন্দ্র মাঝিকে দুই চারিটা ধমক দেওয়াতে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল যে, তাহার একটি মেয়ের ওলাউঠা হইয়াছে, বদ্যিরা তাহাকে বাঁচিবে না বলিয়া জবাব দিয়াছে।

কথাটা শুনিয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের ক্রোধ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি মাঝিকে লইয়া তাহার বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া গ্রামের মাতব্বরদিগকে ডাকাইলেন। গ্রামে যে দুই চারিজন চিকিৎসক ছিল, তাহারাও আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র ছোট মেয়েটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মাঝির হাতে দুইটা টাকা দিলেন। চিকিৎসক প্রভৃতিকে বলিয়া গেলেন,—"আমি ফিরিবার সময় সংবাদ লইয়া যাইব, তোমরা রোগীর কিরূপ যত্ন লইয়াছ।"

বঙ্কিমচন্দ্র গভর্ণমেণ্টের চাকরিতে নিযুক্ত হইয়া যে অসাধারণ তেজস্বিতা, স্বাধীনচিত্ততা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই অপূর্ব্ব। এই তেজ এবং গর্ব্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি কখনও উপরিতন কর্ম্মচারীর অবাধ্য হন নাই। সরকার যখন যেখানে তাঁহাকে বদলী করিয়াছেন,

সেখানেই তিনি তখন অম্লানবদনে গিয়াছেন। কখনও তিনি অনুযোগ করেন নাই বা তোষামোদ করিয়া বদলি রহিত করিতেও কখন চেষ্টা পান নাই। উপরিতন সাহেব যখন যে আদেশ করিয়াছেন, তিনি সহস্র অসুবিধা সত্ত্বেও তখনই সে আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞান সাতিশয় প্রবল ছিল। অতুল ধনরত্নেও তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারিত না।

সামাজিক ব্যাপারেও বঙ্কিমচন্দ্রের উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কাঁটালপাড়ার নিকটবর্ত্তী গরিফা গ্রামনিবাসী কোনও ভদ্রসন্তান বিদ্যাভ্যাস করিতে সমুদ্রপারে গিয়াছিলেন। তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেখিলেন, সমস্ত সমাজ তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছে। তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সমাজে তাঁহার স্থান হইল না।

অবশেষে তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। কিন্তু জাতি বা সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। অবশেষে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের দয়া হইল। তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অবশেষে বলিলেন,—"দেখ, তুমি একটা কাজ কর। একটা রবিবার দেখিয়া তোমার বাড়ীতে আমার আহারের নিমন্ত্রণ কর, আমি তোমার বাড়ীতে যাইয়া খাইয়া আসিব।"

ভদ্রলোক তাহাই করিলেন। এক রবিবারে তাঁহার গৃহে বঙ্কিমচন্দ্রের আহারের নিমন্ত্রণ হইল। বঙ্কিমচন্দ্র রবিবার দিন

বেলা নয়টার সময় শিয়ালদহে রেলগাড়ীতে উঠিলেন এবং বেলা দশটা সাড়ে দশটার সময় নৈহাটীতে নামিয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া নিমন্ত্রণকারীর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন।

আহারাদি শেষ করিয়া অপরাহ্ণে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের বাড়ীতে যাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। দুই একটা কথা বলার পর বঙ্কিমচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, "দাদা, একটা কাজ করেছি।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি করেছ ?"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন,—"রায়েদের বাড়ী খেয়ে এসেছি।"

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শুনিয়া একটু স্তম্ভিত হইলেন, কিন্তু মুখে কিছু বলিলেন না। ভদ্রসন্তান অচিরে সমাজে স্থান পাইলেন। এইজন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা মোটেই ছিল না। সভা-সমিতিতে তিনি মোটেই বক্তৃতা দিতে পারিতেন না। তিনি তাঁহার এই অক্ষমতা উপলব্ধি করিয়াই বড় একটা সভা-সমিতিতে যোগদান করিতে চাহিতেন না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাধারণ কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইত না। কিন্তু যখন তিনি তর্কের আসরে অবতীর্ণ হইতেন, তখন তাঁহার ভিন্ন রূপ। তখন তাঁহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয় আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত,—হস্তপদ অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সময় সময় ঈষৎ কম্পিত হইত,—একটা প্রতিভার ছটা সমস্ত মুখমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইত।

থিয়েটারের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের চিরদিনই অনুরাগ ছিল।

কিন্তু অভিনয় মনঃপূত না হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিতেন। একবার 'মৃণালিনী' অভিনয়-কালে একটা গানের সুর তাঁহার মনোমত হয় নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ রঙ্গালয় হইতে প্রস্থান করিলেন। একবার 'আনন্দমঠের' অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু শান্তির অভিনয় তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি রঙ্গালয় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। আর একবার 'দেবীচৌধুরাণী' অভিনয় দেখিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আমার পুস্তকখানা মাটি করিয়াছে।"

যাত্রা দেখিতে তিনি ভালবাসিতেন না। কিন্তু যাত্রার গান শুনায় তাঁহার খুব আগ্রহ দেখা যাইত। বঙ্কিমচন্দ্র কীর্ত্তন শুনিতে বড় ভালবাসিতেন।

তামাক ও চা,—বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইটি জিনিষেরই সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। চা অত্যন্ত গরম না হইলে তিনি তাহা পান করিতেন না। আবার চায়ের পরিমাণও নিতান্ত কম ছিল না,—প্রত্যেক বারে বড় বড় দুই বাটি। তামাক তাঁহার অবিরাম চলিত,—লিখিতে বসিলে ত কথাই নাই।

অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সাম্য' নামক গ্রন্থে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন,— "লক্ষ্মীগণকে গৃহমধ্যে বন্যপশুর ন্যায় বদ্ধ রাখা অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্ম্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা চাতকের ন্যায় স্বর্গ মর্ত্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড় কাঠা ভূমির মধ্যে, পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে, পৃথিবীর আনন্দ,

ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশ হইতে বঞ্চিত থাকিবে। * * * জিজ্ঞাসা করি, তোমার অপমান, তোমার লজ্জার অনুরোধে, তাহাদিগের উপর পীড়ন করিবার তোমার কি অধিকার? তাহারা কি তোমারই মানরক্ষার জন্য, তোমারই তৈজসপত্রাদি মধ্যে গণ্য হইবার জন্য দেহ ধারণ করিয়াছে? তোমার মান অপমান সব, তাহাদের সুখ দুঃখ কিছু নহে?"

বহুবিবাহেরও বঙ্কিমচন্দ্র বিরোধী ছিলেন। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু সেই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয়, এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এদেশের জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এদেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, "বহুবিবাহ অতিশয় সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।"

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—

"সকলেই এখন স্বীকার করেন, কন্যাগণকে একটু লেখাপড়া শিক্ষা করান ভাল। কিন্তু কেহই প্রায় এখনও মনে ভাবেন না যে, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও নানাবিধ সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি কেন শিখিবে না? যাঁহারা, পুত্রটি এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা

করেন, তাঁহারাই কন্যাটিকে কথামালা পর্য্যন্ত সমাপ্ত করাইয়া চরিতার্থ হন। কন্যাটিও কেন যে পুত্রের ন্যায় এম্, এ, পাশ করিবে না, এই প্রশ্ন বারেক মাত্রও মনে স্থান দেন না।

* * * *

"স্ত্রীশিক্ষা বিধেয় কিনা? বোধ হয় সকলেই বলিবেন, —'বিধেয় বটেই'।"

যৌবনের প্রথম ভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা ছিল না। তিনি ছিলেন অনাচারী ও নাস্তিক। তিনি মাতাপিতাকেই একমাত্র উপাস্য জ্ঞান করিতেন, আর কিছুই তিনি মানিতেন না। আহারাদির প্রতিও তাঁহার হিন্দুজনোচিত নিষ্ঠা ছিল না। যতদিন তিনি কলেজে পড়িতেন, ততদিন অনাচারী ছিলেন না। কলেজ ত্যাগ করিয়া যখন মাতাপিতার সান্নিধ্য হইতে দূরে কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেলেন, তখন তিনি ইচ্ছামত আহার বিহার আরম্ভ করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তেইশ বৎসর বয়সে অনাচারী; ত্রিশ বৎসর বয়সে যখন 'কপালকুণ্ডলা' লেখেন, তখন নাস্তিক। কিন্তু যখন গৃহে মাতাপিতার নিকট আসিতেন, তখন তাঁহার চরিত্রে বা আচার ব্যবহারে কিছুই দোষনীয় লক্ষিত হইত না।

চল্লিশ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের সূচনা হয়। এই ধর্ম্মভাবের প্রথম তরঙ্গ 'আনন্দমঠ'' দ্বিতীয় তরঙ্গ 'দেবীচৌধুরাণী'। বঙ্কিমচন্দ্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়স হইতে যে

সমুদয় উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন, তখন ভগবৎ প্রেম ছিল তাঁহার লক্ষ্য। আটচল্লিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' লিখেন, তখন তাঁহার হৃদয় ভগবৎ-প্রেমবন্যায় প্লাবিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মমত অত্যন্ত উদার ছিল। খাদ্যবিশেষে বা বিলাত-গমনে যে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তাহা তিনি স্বীকার করিতেন না। এজন্য তাঁহাকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ বয়সে পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, শুধু হিন্দু নন, তিনি হিন্দুধর্ম্মের নেতা ছিলেন। গীতাকে তিনি পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন এবং প্রত্যহ ভক্তিসহকারে গীতা পাঠ করিতেন। রোগ হইলেও তিনি ঔষধ না খাইয়া কেবল গীতা-পাঠকেই পরম মহৌষধ বলিয়া মনে করিতেন।

সমাপ্ত